মনের ভ্রম



শুশ্রূষা, দেহ-ঘর, অনার্য্যের উপকথা, কাশ্মীরী উপকথা,

বঙ্গের উপকথা, তিব্বতী কথা, মজার ছবি,

খোকার হাসি প্রভৃতির

গ্রন্থকার

শ্রীশ্যামাচরণ দে প্রণীত

দি বুক কোম্পানী,

৪।৪এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

১৯২৫

মূল্য পাঁচ সিকা

প্রবাসী প্রেস
৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

যিনি

আমাকে

পিতারূপে বাৎসল্য করিতেন, **মাতা**রূপে স্নেহ-কোমল আলিঙ্গনে

বুকে ধরিতেন, **ভ্রাতা**রূপে আদর-যত্ন করিতেন, **বন্ধু**রূপে

মন্ত্রণা দিতেন, **সখা**রূপে সহাচর্য্য করিতেন,

স্বামীরূপে সংরক্ষণ করিতেন এবং

স্ত্রীরূপে সেবা ও সোহাগ

ক রি তে ন

একাধারে

আমার

পিতা-মাতা-ভ্রাতা-বন্ধু-সখা-স্বামী-স্ত্রীস্বরূপ

সেই

মহাপ্রাণ

চিরকুমার শরচ্চন্দ্র রায়ের

বিদেহ-আত্মার

উদ্দেশে

এই গ্রন্থ

ভক্তিভরেনিবেদিত হইল।

উপহার-পৃষ্ঠা

আমার

....

শ্রী.....................................কে

..........................উপলক্ষে

এই গ্রন্থখানি

প্রদত্ত হইল

শ্রী.....................................

....

মনের ভ্রম

—·-০:◯:০-·—

এক

বন্ধন-সূত্র

বল্লভপুরের আদি জমিদার রতিবল্লভ চৌধুরী যখন সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করেন তখন তাঁহার দুই পুত্র প্রাণবল্লভ ও জীবনবল্লভকে কাছে ডাকিয়া বলিয়া যান যে তিনি তাঁহার বুকের রক্ত দিয়া যে জমিদারীর ভিত পত্তন করিয়া গেলেন তাহারা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া যেন সে ভিতকে কখনও বিভক্ত না করে। পাছে পরের ঘরের মেয়ে পুত্রবধুরা আসিয়া ঘর ভাঙ্গায় সেই ভয়ে পুত্রদ্বয়কে মীরপুরের জমিদার রায়বাহাদুর তারিণীকান্ত রায় মহাশয়ের দুই কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া দুরদর্শী রতিবল্লভ বাবু মনে মনে অনেকটা স্বস্তিবোধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে বোনে বোনে কখনই অসদ্ভাব হইবে না।

পুত্রদ্বয়ের বিবাহের একবৎসর পরই যখন তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ভূবনমোহিনী দেবী একদিনের বিসূচিকা রোগে অকস্মাৎ সকল

বন্ধন মুক্ত করিয়া কোন অজানা দেশে চলিয়া গেলেন, তাহার কিছু দিন পরই অভিজ্ঞ রতিবল্লভ বাবুর বুঝিতে বাকি রহিল না যে তিনি যে সূত্রে বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য দুই সহোদরাকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিয়া আনিয়াছেন সেই বন্ধন-সূত্র ছিন্ন হইতে বিলম্ব নাও হইতে পারে। তাই পরপার হইতে যখন একদিন তাঁহার ডাক আসিল তখন আজীবন দেহের প্রতি রক্তবিন্দুপাতে যে জমিদারীর পত্তন করিয়াছিলেন তাহার ভবিষ্যত ভাবিয়া মনে গভীর আক্ষেপ হইতে লাগিল, এবং অন্তিম কালে সে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহার স্বস্তি রহিল না।

প্রাণবল্লভ ও জীবনবল্লভ দুই সহোদরে গলায় গলায় ভাব—একবারে 'হরিহর-আত্মা' বলিলেও চলে। কিন্তু তাঁহাদের গৃহিণীদ্বয় বিমলা ও উর্মিলা দুই সহোদরা হইলেও এক বাড়ীতে আসিয়া জায়ের সম্পর্কই তাঁহাদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল—ভগিনীর সম্পর্ক আর ততটা মনে স্থান পাইল না। জমিদারের গৃহিণীদের সাধারণতঃ বাপের বাড়ী যাওয়া হয় না—হইলে হয়ত দুই বোন মায়ের কোলের কাছে দাঁড়াইলে পুনরায় বাল্য প্রণয়ের স্মৃতি জাগিয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে সুযোগ ঘটিবারও কোন সম্ভাবনা রহিল না। উর্মিলার যদিও পূর্ব্ব ভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, কিন্তু বিমলা শাশুড়ীর মৃত্যুর পর গৃহের কর্তৃপদে অধিষ্ঠিত হইবার কিছুকাল পরই ছোট বোনটির প্রতি আর সে ভাব রক্ষা করিতে পারিলেন না।

রতিবল্লভ বাবুর মৃত্যুকালে প্রাণবল্লভের বয়স ছিল একুশ এবং জীবনবল্লভের সতর। জ্যেষ্ঠের বয়স একুশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার তত্ত্বাবধানেই জমিদারী চলিতে লাগিল। উভয়ের শ্বশুর তারিণীকান্ত রায় মহাশয় জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বন্দোবস্ত করিয়া ছিলেন। তারিণীকান্ত বাবুর অভিজ্ঞ বৃদ্ধ দেওয়ান

ছোট বাবুর ভবিষ্যত অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া [illegible] অব [illegible]ত্রে দেওয়াই সঙ্গত একথা তখনই বলিয়াছিলেন, কি[illegible] মধ্যে একান্ত ঘনিষ্ঠতার ভাব দেখিয়া শ্বশুর তারিণীকান্তের [illegible] ঘুণাক্ষরেও কোনও আশঙ্কার উদয় হয় নাই।

ময়মনসিংহ জিলার সদর [illegible]র ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব [illegible] বিস্তর জমিদার [illegible]ধান স্থান আছে। ব্র[illegible]তীরস্থ [illegible]পুর ইহারই একটী অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রাম। [illegible]ত্রের [illegible]তীরস্থ একটী জমিদার প্রধান স্থান। ইহার [illegible] [illegible]দারের বাস।

যে সময়ের কথা বলি[illegible] জ[illegible]দার শ্রেণীর কাহারও কোনও স্কুলে অপর সাধারণ বা[illegible]হিত একত্রে পাঠ করিবার রীতি ছিল না। ইহার ফ[illegible] [illegible]মিদারবর্গের বিদ্যাশিক্ষা কিঞ্চিৎ বাঙ্গালা লেখ[illegible]প্তি হইত। গৃহশিক্ষকের সাহায্যে কাহারো কচিৎ [illegible]ার সুযোগ ঘটিত। কাজেই ইহাদের জ্ঞান অতি[illegible]মিত [illegible]এবং নানা কুসংস্কার ও অজ্ঞতার অন্ধকারে ম[illegible] হই[illegible]পারিত না। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনেরা কখনও [illegible] বিদেশে গেলে কিম্বা রাজপূজার পর্ব্বোপলক্ষে [illegible]লে নিজেদের কূপমণ্ডুকতার বিষয় উপলব্ধি করিয়া মনে মনে নি[illegible]ঙ্কোচ বোধ করিতেন এবং নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেন!

মীরপুরের তারিণীকান্ত রায় মহাশয় 'রায় বাহাদুর' প্রাপ্তির প্রলোভনে বিবিধ উপচারে উহার তদ্বির করিতে অনেক বার [illegible]জধানী কলিকাতায় যাতায়াত করিয়া যথেষ্ট বাহিরের জ্ঞান লাভ ক[illegible]য়াছিলেন এবং বিদ্যাচর্চ্চার অভাব অনেক সময় ঠেকিয়া বুঝিয়াছিলেন। তাই

বড় জামাতা প্রাণবল্লভ জমিদারীর ভার গ্রহণ করিয়া যখন কনিষ্ঠ জীবনবল্লভকে নশিরাবাদ শহরে রাখিয়া ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া শ্বশুর মহাশয়ের অভিমত জানিতে চাহিলেন তখন অভিজ্ঞ তারিণীকান্ত প্রবল উৎসাহের সহিত তাহার সমর্থন করিলেন।

জমিদারতনয় জীবনবল্লভ যখন ময়মনসিংহের এক মাত্র ইংরাজি বিদ্যালয় জিলাস্কুলে গিয়া ভর্ত্তি হইলেন তখন শহরময় একটা টি-টি পড়িয়া গেল। কারণ তখনকার জমিদারগণ পুত্রদিগকে সর্ব্ব সাধারণের সঙ্গে একত্রে পড়িতে দেওয়া মানহানিকর মনে করিতেন। তাই লোকের কাছে ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার মনে হইল। জীবনবল্লভ নিষ্ঠাবান হিন্দুর ছেলে, প্রতিদিন স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়া তাঁহাকে স্নান করিতে হইত। স্কুলের নানা জাতের ছেলের সঙ্গে গা-ঠেকাঠেকি হয়, কাজেই বল্লভপুরের তর্কালঙ্কার মহাশয় শুচিতার এই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহার জন্য স্কুলে পৃথক আসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কিন্তু ইন্‌স্পেক্টার সাহেব স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া এই বৈষম্যের ব্যবস্থায় হেড মাষ্টার মহাশয়কে নিন্দা-সূচক কিছু বলায় অপর সকল বালকের ন্যায় তাঁহারও সকলের সহিত এক সঙ্গে বসিবার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে ঢাকা হইতে স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টার সাহেবও এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন ....It is a matter of novelty.........ইহা এক অভিনব ব্যাপার!

জীবনবল্লভ অতিশয় মেধাবী এবং অতি অমায়িক প্রকৃতির ছিলেন। পড়াশুনায় যেমন ক্লাশে সকলের উপরে থাকিতেন, সুমিষ্ট ব্যবহারে তেমনই সকল সহপাঠীদের সহিত বন্ধুভাবে মিশিতেন। তাঁহার

স্নেহপ্রবণ হৃদয় গরীবের দুঃখে গলিয়া যাইত। তখন কত নিঃসহায় ছাত্র যে তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাইত তাহার সংখ্যা ছিল না।

ক্রমে স্কুলের পড়া শেষ হইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। তখন ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল পথ খোলা হয় নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হইলে সকলকেই ঢাকায় যাইতে হইত। নৌকায় ঢাকায় যাইতে তিনচারি দিন সময় লাগিত। তখন সকলে দল বাঁধিয়া এক এক নৌকায় আট দশ জন করিয়া ছাত্র এবং তাহাদের অভিভাবক স্বরূপ এক জন করিয়া শিক্ষক যাইতেন। এইরূপে এক সঙ্গে তিন চারি খানি নৌকা কাছারীর ঘাট হইতে যাত্রা করিত।

সেইবার এই সঙ্গে একখানা পৃথক নৌকায় জীবনবল্লভ ও তাঁহার একজন সহপাঠী এবং ঠাকুর চাকর সঙ্গে লইয়া পরীক্ষা দিতে ঢাকায় চলিলেন। কিন্তু জমিদারপুত্রের খাম খেয়ালি তখনও তাঁহার মাথা হইতে একেবারে ছাড়িয়া যায় নাই। কিছু দূরে গিয়াই তাঁহার মন দেশে যাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনকে সংযত করিবার শিক্ষা পাইবার সুযোগ প্রায়ই ইঁহাদের ঘটে না। যাহা যখন মনে আসে তাহা করাই চিরকালের অভ্যাস। তাই মন গৃহমুখী হওয়া মাত্র মাঝিকে নৌকার মুখ ফিরাইয়া বিপরীত দিকে নৌকা বাহিতে আদেশ করিলেন।

সে আদেশ শুনিয়া সকলে অবাক্ হইল। সহপাঠী ত একেবারে প্রমাদ গণিল। বাবুর খেয়াল মত ফিরিয়া গেলে, তাহার আর পরীক্ষা দেওয়া হয় না। পরীক্ষা দিতে যাওয়াই ত বাবুর একটা খেয়াল মাত্র। কারণ জমিদারের ছেলে কে কবে পরীক্ষা পাশ করিতে [illegible] বাবুদের অর্থেই তাহার এতদূর পড়া চলিয়াছে। সহপাঠী হইলেও বাবুর মুখের উপর সাহস করিয়া কিছু প্রতিবাদও করিতে পারে না।

তাই অনেক ভাবিয়া অতি সঙ্কোচের সহিত বলিল—"বাবু কি তবে বাড়ীতেই ফিরিয়া যাইবেন? পরীক্ষার আর এক সপ্তাহ মাত্র বাকী। এর মধ্যে কি ফিরিয়া আসা চলিবে?" জীবনবল্লভ বাবু বলিলেন—"না, এখন আমার বাড়ীতেই যাওয়া চাই। পরীক্ষা না হয় পরেই দেওয়া যাবে।" একথার উপর আর কথা কি? উত্তরে কিছু বলিতে আর তাহার সাহস হইল না। নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া নিতান্ত ক্ষুন্নমনে চুপ করিয়া রহিল!

বারবার তিন বার এইরূপে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে নৌকা ফিরাইয়া দেশে চলিয়া যাওয়ার পর বাস্তবিকই শেষবারে জীবনবল্লভ বাবু পরীক্ষা দিতে ঢাকায় গেলেন। সেবারে পরীক্ষা বেশ ভালই দিলেন এবং দক্ষতার সহিত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন। ময়মনসিংহের জমিদারদিগের মধ্যে সম্ভবতঃ এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ।

দুই

নব্য দারোগা

তখনকার ছাত্রমহলে জিলাস্কুলের শিক্ষক কৃষ্ণকালী বসুর বড় নাম। তিনি যেমন ছাত্রদের সঙ্গে মিশিতেন, তাহাদিগকে আদর করিতেন, নানা উপদেশ দিয়া তাহাদের মনে যাহাতে উচ্চভাব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেন, ছাত্রেরাও তেমনি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হইত। তখন তাঁহার নবযৌবন, নবীন উদ্যম। ময়মনসিংহের সকল সৎকার্য্যে তাঁহাকে যোগ দিতে দেখা যাইত। বিশেষ ভাবে ছাত্রদের জন্য সভা-সমিতি, সম্মিলন ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠানের তিনিই সূত্রপাত করেন। বলিতে গেলে তাঁহারই যত্ন ও উৎসাহ উদ্যমে ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতির স্থাপনা হয়।

এই সারস্বত সমিতি যদিও প্রথমতঃ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'বসন্ত পঞ্চমী'র অনুকরণে স্থাপিত হয় তথাপি উহা কেবল সমসাময়িক বন্ধু-বর্গকে লইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক সুখ-সম্মিলন ছিল না। ইহা যেমন বাণী-বরেণ্য সম্মিলন ছিল, তেমনি কালে ইহার সহিত কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী, ঘোড়দৌড়, ব্যায়াম ও বিবিধ বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থায় এক বিরাট আকার ধারণ করিয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্ম-খৃষ্টিয়ান, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের একত্র সম্মিলিত হওয়ার এমন স্থান আর ছিল না। বাগ্‌বাদিনী বীণাপাণির নামে আহুত হওয়ায় এই সকল বিভিন্ন সমাজের ও বিভিন্ন

অবস্থার লোক এক সমতলক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পরস্পরে প্রাণ খুলিয়া আলাপ পরিচয় করিবার ও বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাই স্থানীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহাতে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, ভূম্যাধিকারীগণ ইহার পৃষ্টপোষক হইয়া দাড়াইয়াছিলেন, ছাত্রগণ ইহার জন্য উৎসাহে উন্মত্ত হইয়াছিল এবং উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণও ইহাতে যোগদান করিয়া বিশেষভাবে উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

নূতন উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ হইয়া যখন কৃষ্ণকালী বাবু ছেলেদিগকে লইয়া মাতিয়াছেন তখন ব্রাহ্মসমাজেরও নূতন জাগরণের দিন; কুচবিহার-বিবাহের প্রবল আন্দোলন তখনও আরম্ভ হয় নাই। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের উদ্দিপনী বক্তৃতা ও জ্বলন্ত উপাসনায় তখন শহর সরগরম। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নীরবে তাঁহার বক্তৃতা শুনিত; তেমন সুমিষ্ট বিশুদ্ধ ভাষা আগে সেখানে কেহ শুনে নাই। একটা লোক যে ঘণ্টা দুই দাড়াইয়া কোনও কাগজ বা পুঁথিপত্র না দেখিয়া অনর্গল বলিয়া যাইতে পারে এমনত কেহ দেখে নাই। কাজেই তাহা দেখিয়া সকলে একবারে অবাক হইয়া যাইত। এই বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণকালী বাবুও এই দলে ভিড়িতে লাগিলেন।

তখনকার দিনে জিলাস্কুলের হেড মাষ্টারদিগের অনেকেই শেষ কালে ডেপুটী কালেক্টর হইতেন। বিচারবিভাগে যাহাতে সুদক্ষ চরিত্রবান লোকের প্রভাব বিস্তৃত হয় সেজন্যই বোধ হয় এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পুলিস বিভাগেও সে সময়ে শিক্ষিত সৎলোক নিযুক্ত করিতে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত। জিলাস্কুল হইতে কয়েকটী শিক্ষকই ক্রমে পুলিসবিভাগে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেবার এবিষয়ে হেডমাষ্টার একদিন অপর মাষ্টারদের মতামত জিজ্ঞাসা করেন।

সকলেই একবাক্যে বলিলেন কৃষ্ণকালী বাবুকেই তাঁহারা যোগ্য লোক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তিনি তখন ব্রাহ্মদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং নানা সৎকার্য্যে ছাত্রদিগকে লইয়া এমন উৎসাহে মাতিয়া আছেন যে তিনি সে সকল ছাড়িয়া যে এমন কাজ গ্রহণ করিবেন ইহা কেহ ভাবিতেও পারিলেন না।

শীঘ্রই সকলের সে ধারণা ভ্রমে পরিণত হইল। কয়েকদিনের মধ্যেই পুলিসের এক দারোগার কাজ খালি হইল এবং তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণকালী বাবু নিজে উদ্যোগী হইয়া সে কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কাজ লইয়াই তাঁহাকে জামালপুর মহকুমায় যাত্রা করিতে হইল। ময়মনসিংহ ছাড়িবার পূর্ব্বে ছাত্রসভা হইতে তাঁহাকে এক অভিনন্দন দেওয়া হইল। ছাত্রেরা অনেকে চোখের জল ফেলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিল। এমন লোক পুলিসের কাজে যাইতেছেন দেখিয়া অনেকে মর্ম্মপীড়িত হইল। সকলে ভাবিল, হায়, এ কি হইল? ইহা যেন কল্পনারও অতীত! কিন্তু মানুষ ভাবে এক, ঘটে আর।

মানুষের বাহিরের আকার দেখিয়াই যদি তাহার ভিতর কেমন কেহ বলিতে পারে তাহা হইলে কৃষ্ণকালী বাবুর বেলায় নিশ্চয়ই তাহাকে হার মানিতে হইত। কৃষ্ণকালী নাম দেখিয়াই পাঠকপাঠিকা-গণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন তাঁহার গায়ের রং কেমন ছিল; আর তখন নূতন দলের সঙ্গে মিলিয়া ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন তাহাতে ইহাও হয়ত বুঝিতে বাকী নাই যে তাঁহার নিশ্চয়ই আবক্ষবিলম্বিত দীর্ঘ শ্মশ্রুরাজিতে বদনমণ্ডল আচ্ছন্ন ছিল। ইহার উপর যদি রুধিরাক্ত নয়নযুগল তীব্র কটাক্ষবাণে বিদ্ধ করে তবেই বুঝিতে [illegible] যে দারোগা বাবু যে গ্রামে যাইতেন তাঁহার সেই ভীষণ দর্শন মূর্ত্তি দেখিয়া কাহার না হৃদকম্প উপস্থিত হইত! কিন্তু আবার এই সুদীর্ঘ শ্মশ্রুআবরিত

বক্ষস্থলের অন্তঃনিহিত মহাপ্রাণতা এবং কোমলতার স্পর্শানুভব করিয়াই বালকের দল তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত এবং শেষ জীবনে পুরাতন ছাত্রবৃন্দের কেহ তাঁহাকে দেখিবামাত্র সেই পূর্ব্বের 'মাষ্টার মহাশয়' সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না।

পুলিসে কাজ করার বিপদ এবং অসুবিধাও কত! পুলিসের নাম শুনিলেই লোকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয় এবং সকলে মনে করে ও কি এক ভয়ানক জীব! কোনও ভদ্রলোক সহজে কাছে ঘেসিতে চায় না, আবার কাহারো নিকটে গেলেও সহসা কাছে ভিড়িতে দেয় না, বরং সরিয়া পড়িতেই চেষ্টা করে। পুলিসের উপর কাহারো বিশ্বাস নাই, নিতান্ত আত্মীয় ভাবে কথা বলিলেও লোকের মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হয়। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উহারা না করিতে পারে এমন কাজ নাই—এই লোকের ধারণা! কৃষ্ণকালী বাবুকে দারোগারূপে এরূপ অনেক দুর্ভোগ ভুগিতে হইত। ছেলে ঠেঙ্গাইবার কাজ ছাড়িয়া চোরডাকাত ঠেঙ্গাইবার কাজে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার কোমল হৃদয়-বৃত্তির বিনাশ হয় নাই। কিন্তু সাধারণে তাহা বুঝিবে কেন?

কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে অনেক সময় কঠোর হইতে হয়, দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে হয়; নতুবা ন্যায়পরতার মর্য্যাদা থাকে না। কিন্তু একবারে নিষ্ঠুর অভদ্র ও অসভ্য না হইলে যে চলেনা তাহা কখনই নয়। দস্যু বা তস্কর বলিয়া কাহাকেও ধরিয়া আনিলে সকলেই তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হয় এবং গালাগালি দেয়। এমন কি দেখিতে পাওয়া যায় যে অপরাধীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার না করিলে যাহার গৃহে চুরি বা ডাকাতি হইয়াছে তিনি হাজার শিক্ষিত বা পণ্ডিত হইলেও পুলিসের উপর মনে মনে চটিয়া যান। কিন্তু দস্যুতস্করের ভিতরেও যে প্রাণ আছে, কোমলতর বৃত্তি সকলও অন্তঃস্থলে নিহিত আছে এবং তাহা

ধরিয়া কাজ করিতে পারিলে যে কত সুফল লাভ করা যায় সেদিকে অতি অল্প লোকেরই দৃষ্টি পড়িয়া থাকে। যাহারা কোনদিন কাহারও নিকট মিষ্ট ব্যবহার পায় না, কখনও কোন ভালকথা শুনিতে পায় না, তাহাদিগকে যদি কোনও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি রুদ্র শাসন না করিয়া মিষ্ট সম্ভাষণ করেন বা সদুপদেশ দেন, তাহাদের দুঃখের কাহিনী বা অভাবের কথা মন দিয়া শুনেন তাহা হইলে দেখা গিয়াছে যে অনেক পুরাতন চোরডাকাতের শুষ্ক কঠোর হৃদয়ও একবারে গলিয়া যায় এবং তাহারা 'হাউ-হাউ' করিয়া কাঁদিতে থাকে।

এই ভাবে কাজ করিতে গিয়া কৃষ্ণকালী বাবুকে সময় সময় কি বিষম সমস্যায় পড়িতে হইয়াছে তাহা বলিবার নয়। একবার কোন এক স্থানের এক গবর্ণমেণ্ট আফিস হইতে প্রায় দুই হাজার টাকা পরিমাণের কারেন্‌সি নোট ও নগদ টাকা চুরি যায়। সেই চুরি মোকদ্দমার তদন্ত করিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইলে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়া সকল অবস্থা বিস্তারিত ভাবে জানিতে লাগিলেন এবং রীতিমত তদন্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই আফিসের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন এম্, এ; বি, এল! স্থানীয় আরও অনেক শিক্ষিত লোকও তাঁহার পক্ষ হইতে দারোগা বাবুর তদন্ত কার্য্যে সহায়তা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল যে তিনি কিছুতেই তাঁহাদিকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছেন না।

অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারা গেল তাহাতে সকলের মনে হইল যে সেই আফিসের পাহারায় নিযুক্ত লোকদিগের মধ্যেই কেহ এই চুরি করিয়াছে। অপর সকলের ন্যায় তাঁহার মনেও সেই সন্দেহই বদ্ধমূল হইয়াছে কিন্তু পাহারায় নিযুক্ত লোক একজন বা দুইজন নয়, বহু। কাজেই সেই অনেকের মধ্যে ঠিক কে যে এই কার্য্য করিয়াছে তাহা

নির্দ্দেশ করা কঠিন। ক্রমান্বয়ে চারি পাঁচ দিন তদন্ত করিয়াও যখন তিনি ইহার কোনও কিনারা করিতে পারিলেন না তখন সকলে নিরাশ হইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতিও ঘটিল।

শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই অভিপ্রায় যে পাহারার যত পেয়াদা আছে তাহাদের সকলকে বাঁধিয়া সমানে 'পিটান' হউক, তাহা হইলেই প্রকৃত অপরাধী যে কে উহারা আপনা হইতেই তাহা বলিয়া দিতে বাধ্য হইবে। কথাই আছে—'কিলের ডরে ভূত পলায়!' দারোগা বাবু যে কেন এই সনাতন পন্থা অবলম্বন করেন নাই ইহা দেখিয়া সকলে মনে মনে রুষ্টও হইলেন। তবে দারোগা বাবুর সেরূপ প্রবৃত্তি নাই দেখিয়া এবং তাঁহাদ্বারা এরূপ কিছু করানও সম্ভবপর হইবে না ভাবিয়া তাঁহারা প্রকাশ্যে সে প্রস্তাব করিলেন না বটে, কিন্তু ভদ্রতা রক্ষা করিয়াই পরস্পর বলিতে লাগিলেন—"না, সেকালের দারোগা না হলে এসব কাজ হয় না; এসব কি আর ভাল মানুষির কাজ?"

দারোগাবাবু নীরবেই এ সকল মন্তব্য শুনিলেন এবং নীরবেই তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে লাগিলেন। যখন নিজের স্বার্থ উপস্থিত হয় তখন উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত সুসভ্য ভদ্র লোকেরাও যে কিরূপ বিবেক শূন্য এবং ন্যায়ান্যায় বিবেচনা রহিত হইয়া পড়েন ইহা ভাবিয়া তিনি মনে মনে বড়ই ক্লিষ্ট হইলেন। কিন্তু নিজে আপন কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট বা নিরাশ ও নিরুদ্যম হইলেন না। তিনি তখন তদন্তের কাজ যথাসম্ভব চালাইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগকে কেবল এই কথা বলিলেন যে যে যে পন্থা অবলম্বন করা তিনি উচিত ও আবশ্যক মনে করেন সে সকল দেখা [illegible] হইলে তিনি নিজেই এ মোকদ্দমা কোনও সেকালের দারোগার জন্য রাখিয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিবেন।

কথায় বলে 'ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে'। আট দশ দিন তদন্তের

পর অভাবনীয়রূপে সেই মোকদ্দমার 'আস্কারা' হইয়া পড়িল। যখন প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়িল এবং তাহার নির্দ্দেশমত এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থান হইতে লুক্কায়িত নোট ও থলিয়াসহ অপহৃত সকল টাকাই উদ্ধার করা হইল তখন সে স্থানে আনন্দকোলাহলের আর সীমা রহিল না। অপহৃত মাল জঙ্গলমধ্যে বাহির হওয়ামাত্র সেই সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তখন যে যেমন অবস্থায় ছিলেন অপেক্ষা মাত্র না করিয়া সকলে সেখানে ছুটিয়া আসিলেন। সেই এম্, এ: বি, এল, বাবু তখন স্নান করিতে গিয়া গায়ে সাবান মাখিতেছিলেন। এই সংবাদ শুনিবামাত্র তিনি সেই সাবান হাতে করিয়াই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেহ স্নানান্তে পূজা আহ্নিক করিতে যাইতেছিলেন, তখন পূজা ফেলিয়াই দৌড়িয়া আসিলেন। কেহ খড়ম পায়ে, কেহ বা খালি পায়ে, কেহ গামছা কাঁধে আবার কেহ বা ছাতা হাতে হাসিতে হাসিতে আসিয়া হাজির! শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের উল্লাসধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ হইল। তখন তাঁহাদের মনের ভ্রম দূর হইল এবং সকলে সুর বদলাইয়া সেকেলে দারোগার নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন।

যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল সে পাহারাদারদিগেরই একজন। সরকারী তহবিলের ঐ টাকার থলিয়া ও নোটগুলি এমনই অসতর্ক ভাবে রাখা হইয়াছিল যে তাহা সরাইয়া ফেলিতে বড় একটা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় নাই। এতগুলি টাকা অতি সহজে আত্মসাৎ করা যায় একি সামান্য প্রলোভনের কথা? ঐ সামান্য বেতনের অশিক্ষিত একটা লোকের মনে এই প্রবল প্রলোভন কিরূপ আধিপত্য করিয়াছিল, সেই অসাবধান কার্য্যকারক যে অসতর্ক ভাবে তহবিলের টাকা ও নোটগুলি তাহার সম্মুখে রাখিয়াছিল তাহা এবং পরে অপরাধী তাহার অন্যায় বুঝিতে পারিয়া যে সরলভাবে সমুদায় স্বীকার করিয়া অপহৃত

ধন বাহির করিয়া দিয়াছে এবং তাহার কিছুমাত্র অপচয় করে নাই এই সকল কথা দারোগা বাবু যখন বিশেষভাবে বিচারক মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বুঝাইয়া বলিলেন তখন বাস্তবিকই তাহার লঘু দণ্ডের আদেশ হইল।

কৃষ্ণকালী বাবুর কার্য্যদক্ষতায় শীঘ্রই ইন্‌স্পেক্টরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং চাকুরী জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই ভাবেই কাজ করিয়া গিয়াছেন। তবে শেষ বয়সে তাঁহাকে অনেক সময় এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে দেখা গিয়াছে যে কেহই একেবারে দোষ শূন্য নহে; কোনও না কোনও দোষ প্রত্যেকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার একবারে গুণহীন সর্ব্বপ্রকার সদ্ভাব বিবর্জ্জিত লোকও প্রায় দেখা যায় না। সেকালের দারোগা অশিক্ষিত ও অত্যাচারী ছিল। তাহাদের অনেকেই সুরাপায়ী ও বেশ্যাশক্ত হইত কিন্তু তাহাদের অসদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থও অনেক সৎকাজে ব্যয় হইত—তাহারা অনেক সময় কত দরিদ্রের ভরণ পোষণ করিত, কত অনাথ বালকের শিক্ষার ব্যয়ভারও বহন করিতে কুণ্ঠিত হইত না এবং কত অনাথ বালিকার বিবাহের খরচ নির্ব্বাহ করিতেও পশ্চাদপদ হইত না। সর্ব্বদা অতিথি অভ্যাগতের সেবা এবং প্রতি মাসে বা বর্ষে বর্ষে গরীব আত্মীয় কুটুম্বের সাহায্য করাও কর্ত্তব্য বলিয়া মানিতে দেখা গিয়াছে। আবার এ কালের শিক্ষিত এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ দারোগাদিগের মধ্যে সেকালের ন্যায় পানদোষ বা ইন্দ্রিয়দোষ ও অমানুষিক অত্যাচার প্রবৃত্তির বিলোপ হইয়াছে বটে কিন্তু উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয় সেকালের তুলনায় বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তিনি আরও দুঃখ করিয়া বলিতেন—'পরোপকারায় সতাং জীবনম্' এই মন্ত্রের প্রয়োগ সে কালের 'অসতাংদের' মধ্যে বরং দেখিয়াছি কিন্তু একালের 'সতাংদের' জীবনে তাহা দেখিতে পাই না।

তিন

সেকালের জমিদার

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন পল্লীগ্রামের জমিদারদিগের বাড়ীতেও টেবিল চেয়ারের বিশেষ প্রচলন হয় নাই। মাটিতে তক্তাপোষের উপর ফরাশ পাতিয়া তাহাতে গালিচা ও মসলন্দ ইত্যাদি দ্বারা পদমর্য্যাদা ও বংশমর্য্যাদানুসারে বসিবার ও বসাইবার বন্দোবস্ত ছিল। গৃহকর্ত্তার বসিবার স্থানে জরির কাজ করা মকমলের বড় বড় তাকিয়া পিছনের দিকে হেলান দিয়া বসিবার এবং ঐরূপ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার ও লম্বাকৃতি অপর দুইটি তাকিয়া দক্ষিণে বামে থাকিয়া চেয়ারের হাতলের কাজ কবিত। অন্যান্য আসবাবের মধ্যে দেয়ালে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রকার ছবি যাহার অধিকাংশই আধুনিক সভ্যতার অনুমোদিত নহে। তা ছাড়া বারান্দায় কাপড়ে ঘেরা খাঁচার ভিতর কোকিল, শ্যামা, দয়েল, বুলবুল ও 'বউ কথা কও' প্রভৃতি পাখী ঝুলিত। তাহারা আপন আপন খাঁচায় থাকিয়া যখন যাহার ইচ্ছা স্বরলহরী ছাড়িতে থাকিত আর বৈঠকখানায় বসিয়া স্বয়ং কর্ত্তা এবং সভাসদবর্গ সকলে তাহা সম্ভোগ করিতেন।

সেকালে পূর্ব্ববঙ্গে স্থলপথে রেলের গাড়ী এবং জলপথে ষ্টীমার ছিল না। সুতরাং বিদেশে যাতায়াত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রীতিনীতি ও চালচলন শিক্ষা করিবার উপায় এবং প্রথাও ছিল না; বিশেষতঃ বড়লোকদিগের মধ্যে নিতান্তই বিরল ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কখনও তীর্থদর্শন-মানসে কদাচিৎ দূরদেশে যাইতেন। কিন্তু তাহাও

ছিল এক অতি বিরাট ব্যাপার! দুই একখানা ভাওলিয়া বা বজরা এবং তৎসঙ্গে চারি পাঁচ খানা দেশীয় নৌকা লইয়া তীর্থযাত্রা করা হইত। বজরায় থাকিতেন কর্ত্তা স্বয়ং এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও অপর নৌকা সকলে থাকিত পাইক, বরকন্দাজ, খানসামা, বেহারা ইত্যাদি ২৫।৩০ জন লোক, ঢাল, তলোয়ার, বন্দুক ও লাঠি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রসহ। ইহা ছাড়া রন্ধনের ও আহার্য্য দ্রব্যাদির জন্য স্বতন্ত্র নৌকায় থাকিত ঠাকুর ও গৃহের দাসদাসী। যেখানে গিয়া সেই নৌবহর উপস্থিত হইত সেখানকার লোকেরা বুঝিত যে পূর্ব্বদেশের একজন খুব বড় লোক যাইতেছেন। পথে দস্যু তস্করের অভাব ছিল না। কাজেই এই নৌসজ্জা কতক আত্মরক্ষার্থ এবং কতক পদমর্য্যাদা রক্ষার্থ আবশ্যক হইত।

কর্ত্তাদের সঙ্গে যেসকল লোক চলিত তাহাদের অধিকাংশেরই বুদ্ধিও ছিল অতি চমৎকার। সে সকল কৌতুকজনক গল্প শুনিলে অতি গম্ভীর প্রকৃতির লোকও না হাসিয়া থাকিতে পারেন না। আবার তীর্থস্থানে গিয়াই কি তাঁহারা কোনও শিক্ষিত সভ্যভব্য লোকের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন? যত অর্থগৃধ্নু স্বার্থপর চাটুকার লোক আসিয়া ইঁহাদের কাছে উপস্থিত হইত এবং নানাপ্রকার তোষামোদে মুগ্ধ করিয়া অজস্র টাকা লুটিয়া লইত। 'কর্ত্তা মহারাজের ন্যায় বড়লোক এবং পুণ্যবান ও দয়াল আর সচরাচর দেখা যায়না' ইত্যাদি চাটু-বাক্যে তাঁহাদের মন গলাইয়া ফেলিত এবং যখন তাঁহারা মুক্তহস্তে সকলকে দান করিতেন তখন স্বয়ং 'দাতাকর্ণ' বলিয়া তাঁহাদের জয় জয়কার পড়িয়া যাইত! এইভাবে দেশপর্য্যটন দ্বারাও ইঁহাদের চক্ষু ফুটিত না, বরং 'হাম বাড়িয়া' ভাবেরই পরিপুষ্টি হইত।

আপন আপন বাড়ী বসিয়া কর্ত্তারা কেবল সম্মানই পাইতেন কিন্তু

অপর কাহাকেও সম্মান দেখাইতে অভ্যস্থ হইতেন না। শুধু রায়ত, খানসামা ও আমলা উমেদারবর্গের সঙ্গে আলাপ-ব্যবহারে সম্মান প্রদর্শনেরও কোন প্রয়োজন হয় না, সুতরাং সেকালে কোনও জমিদারের কাছে কখনও কোন বাহিরের ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলে অনভ্যস্ততাবশতঃ তাঁহাকেও সম্মানসূচক বাক্যে সম্বোধন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। অথচ আপন অধীনস্থ লোকদিগকে যেরূপ অবজ্ঞার সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সেরূপ করাটাও নিতান্ত ভদ্রতার বহির্ভূত হইবে বলিয়া তাহা করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেন। তাই উভয় সমস্যায় পড়িয়া কাহাকেও 'তুমি' বা 'আপনি' সম্বোধন না করিয়া কেবল ভাব-বাচ্যের প্রায়াগ সকল অবলম্বন করিতেন। যথা—'নাম কি? বাড়ী কোথায়? কি কাজ করা হয়? বেতন কত? কোথায় যাওয়া হইবে? কি জন্য আগমন হইয়াছে?' ইত্যাদি, ইত্যাদি। তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের উচ্চ রাজকর্ম্মচারী স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একজন প্রসিদ্ধ জমিদারের ঠিক এইরূপ আচরণের এক হাস্যকর গল্প প্রচলিত আছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রাণবল্লভ ও জীবনবল্লভ দুই সহোদরে কেমন ঐকান্তিক ভাব। তখনকার জমিদারগণ উল্লিখিত আবহাওয়ার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইলেও শ্বশুর তারিণীকান্তের প্রভাবে এবং কনিষ্ঠ জীবনবল্লভের আধুনিক শিক্ষার ফলে জ্যেষ্ঠ প্রাণবল্লভের জীবনে যুগান্তর উপস্থিত করিল। তখন দশ টাকা বেতনের বাঙ্গালানবিশ নায়েব এবং পাঁচ টাকা বেতনের আমলাদ্বারাই জমিদারী সেরেস্তার কাজ চলিত। শিক্ষার আলোক তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনই সুযোগ ঘটিত না। মোসাহেব এবং পারিষদ্‌বর্গও ছিল এই শ্রেণীর লোক। কাজেই জমিদারদিগের জ্ঞানবিকাশের কোনও উপায়

ছিল না বলিলেই চলে। কনিষ্ঠের শিক্ষা ও জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া জ্যেষ্ঠেরও জ্ঞানপিপাসা বর্দ্ধিত হইল।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর জীবনবল্লভ আসিয়া বাড়ীতেই রহিলেন। প্রাণবল্লভ পূর্ব্বেই জমিদারীর ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু স্বয়ং জমিদারীসংক্রান্ত কাজকর্ম্ম বড় একটা দেখিতেন না। এখন হইতে কনিষ্ঠের পরামর্শানুযায়ী নিজে সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। নায়েব বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাকে এককালীন কিছু দিয়া কার্য্য হইতে অবসর দিলেন এবং অধিক বেতনে একজন শিক্ষিত নায়েব নিযুক্ত করিলেন। এদিকে দেশে নানাপ্রকার সৎকার্য্যের সূচনা করিতে লাগিলেন। নিজগ্রামে ডাকঘর, ডাক্তারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রজাদিগের জলকষ্ট নিবারণের জন্য স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিতে লাগিলেন। সত্বরই তাঁহার সুনাম চারিদিকে রটিয়া গেল এবং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হইল। এখন হইতে ঘন ঘন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠিতেও যাতায়াত আরম্ভ হইল এবং সাধারণের সভা-সমিতি ও সাহেবদিগের খেলাধুলাতেও তিনি অকাতরে যোগ দিতে লাগিলেন। শ্বশুর তারিনীকান্তের বিশেষ চেষ্টায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি সরকার হইতে রায় বাহাদুর খেতাব অর্জ্জন করিলেন এবং কিছুদিন পরে স্থানীয় অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদও লাভ করিলেন।

এইসময় হইতে প্রাণবল্লভ পূরাদমে সাহেবী চাল ধরিলেন এবং পোষাকপরিচ্ছদ ও খানাপিনায় সকল বিষয়েই বিলাতীধারা রক্ষা করিয়া চলিলেন। গৃহের আসবাবপত্রও যথারীতি বদল হইয়া বিদেশী ভাবে সজ্জিত হইল। এমন কি পুত্রকন্যাদিগের সাহেবী নামকরণ করিতেও তিনি পশ্চাদপদ হইলেন না। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাখিলেন John—ওরফে জনবল্লভ এবং কনিষ্ঠের নাম রাখা হইল Harry—

ওরফে হরিবল্লভ! এবং একমাত্র কন্যার নামকরণ হইল Nanny—ওরফে ননীবালা। তাঁহার এক চালে দেশীবিলাতী দুই নামই বজায় রহিল। শ্বশুর তারিণীকান্তও রায় বাহাদুর খেতাব প্রাপ্ত হইলে সাহেব-দিগের সাক্ষাতে বিলাতী চালেই চলিতেন এবং বাড়ীতেও রন্ধনের জন্য পাঁচু ঠাকুর ছাড়া বাহির বাড়ীর এক খণ্ডে রহিম বক্সের বাবুর্চ্চিখানাও ছিল। তবে তিনি সকল দিক বজায় রাখিয়া প্রকাশ্য-গোপন ভাবেই সব চালাইতেন, কাজেই প্রাণবল্লভের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার মনে জামাতা বাবাজি যেন একটু অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিলেন বলিয়া বোধ হইলেও প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না।

যেদিন জীবনবল্লভের পাশের খবর আসিল সেই দিনই উষাকালে তাঁহার স্ত্রী উর্ম্মিলা দেবী এক কন্যারত্ন প্রসব করিলেন। পাশের খবরে এবং ছোট বাবুর প্রথম সন্তানের জন্ম উপলক্ষে বাড়ীতে আনন্দ-উৎসবের ধুম পড়িয়া গেল। ভোর হইতেই ফটকের উপরে রস্থনচৌকী বাজিতে লাগিল, ক্রমে ঢাক-ঢোলের বাজনায় কাণে তালা লাগিবার উপক্রম হইল। সারাদিন 'দিয়তাং, ভুজ্যতাং' চলিতে লাগিল এবং সন্ধ্যার আতস বাজীতে সকলের চমক লাগাইল। অবশেষে সারারাত্রি যাত্রাগানে অবসান হইল। উষাকালে জন্ম হওয়ায় এই বালিকার নাম রাখা হইল উষাবালা। কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত প্রাণবল্লভ পূর্ব্ব প্রথায় নাম রাখিলেন Molly—ওরফে মলিনা!

জীবনবল্লভের পাশের খবর আসিবার পর হইতেই তাঁহাকে কলিকাতার কলেজে গিয়া পড়িতে হইবে দুই ভ্রাতায় ইহাই স্থির করিলেন। কিন্তু আমলা মোসাহেব সকলে মিলিয়া অপর সকল জমিদারদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতে লাগিল যে এরূপ করিলে আর কিছুতেই মান বজায় রাখা যাইবেনা। বাবুর এমন কি অভাব উপস্থিত

হইয়াছে যে সাধারণ লোকের ন্যায় এই বয়সেও বিদেশে লেখাপড়া করিতে যাইবেন? যাহাদের পেটের দায়ে চাকুরী করিতে হয় কেবল তাহাদেরইত এসব দরকার। এইরূপ নানা যুক্তিতে আপত্তি তুলিয়া তাহারা ক্রমাগত বাধা জন্মাইতে লাগিল। একে জমিদারী চাল—সকল কাজে ঢিমে তেতালা ভাবে চলাই বড় লোকের কাজ। কাজেই যাওয়া একরূপ স্থির হইলেও যাচ্ছিযাব করিয়া তখন আর যাওয়া হইলনা।

কিছুদিন পর দারোগা কৃষ্ণকালীবাবু বল্লভপুরের সন্নিকটে এক থানায় বদলী হইয়া আসিলেন। ময়মনসিংহ শহরে যখন ইনি জিলাস্কুলের শিক্ষক ছিলেন তখন হইতেই প্রাণবল্লভ ও জীবনবল্লভ বাবুর সহিত ইঁহার আলাপ পরিচয় ছিল। বিশেষতঃ ইঁহার সকল সৎকার্য্যে উৎসাহ দান এবং ময়মনসিংহের নানা সদনুষ্ঠানের সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ দেখিয়া জীবনবল্লভ বাবু প্রথম হইতেই ইঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কৃষ্ণকালী বাবুকে তখন সেস্থানে দেখিয়া জমিদার বাবুদের বিশেষ আহ্লাদ হইল। ইঁহাকে নানা কার্য্যোপলক্ষে অনেক সময় জমিদারবাড়ীতে যাইতে হইত বলিয়া এবারে তাঁহাদের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মিল।

কৃষ্ণকালী বাবু যে থানায় বদলী হইয়া আসিয়াছেন সে পুলিস-ষ্টেশনটি ছিল শহরের বাহিরে—অর্থাৎ বাজার, ডাকঘর, স্কুল, ডাক্তারখানা প্রভৃতি হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, মৃগী নদীর পাড়ে। স্ফটিকস্বচ্ছ শীতল জলে মৃগী নদী বারমাস পূর্ণ থাকিত। ঠিক তাহারই তীরে ছিল এই পুলিসের থানা। স্থানীয় দৃশ্যও ছিল অতি রমনীয় এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক হইতে বায়ু সঞ্চালনের সুযোগও ছিল যথেষ্ট। সুদূরে গারো পর্ব্বতের কৃষ্ণরেখা সুনীল নভোনয়নে কজ্জলরেখার ন্যায় উজ্জল দেখাইত! অদূরে ঘন বনরাজি সুনীল চন্দ্রাতপতলে সুবিস্তৃত হরিৎ

মকমল নির্ম্মিত গালিচাস্তরণের ন্যায় শোভা পাইত। সে শোভা দেখিলে বাস্তবিকই নয়ন মন তৃপ্ত হয়! কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সেখানে জ্বরের এমনই প্রাদুর্ভাব ছিল যে তথায় যাইয়া কেহই অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারিত না। তখন কার্য্যোপলক্ষে থানা হইতে বাহির হইয়া মফঃস্বলে যাইতে পারিলেই রক্ষা পাওয়া যাইত; নতুবা বাসায় পড়িয়া শুধু কম্প-জ্বরে ভুগিতে হইত আর রাত্রিকালে ঘরের পিছনেই ব্যাঘ্রগর্জ্জন শুনিয়া আতঙ্কে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইত। তাই যে কোনও একটা উপলক্ষ ধরিয়া জমিদার বাবুদের বাড়ীতে যাওয়াটা দারোগা বাবুর বিশেষ লোভনীয় ছিল। শিক্ষিত সজ্জনের সঙ্গলাভ ও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি—এই দুইটী ছিল লোভের প্রধান কারণ। অবশ্য বাবুদের বাড়ীতে চর্ব্ব্যচোষ্য—র প্রলোভনটাও একবারে বাদ দেওয়া চলেনা।

একদিন মফঃস্বল হইতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর কৃষ্ণকালী বাবু মৃগী নদীর তীরে বসিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় স্থানীয় প্রাচীন বিগ্রহ ৺শ্রীশ্রীরঘুনাথ জিউর বাড়ীর পূজারী-ঠাকুর আসিয়া বলিলেন—"দারোগা বাবু, আগামী কল্য আপনারা সকলে রঘুনাথ জিউর বাড়ীতে যাইয়া বেগার দিবেন।" ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া দারোগাবাবুর আপাদ মস্তক জলিয়া গেল! থানার উপরে আসিয়া স্বয়ং দারোগাকে অপমান! এত বড় দুঃসাহস!! চিরকাল পুলিসের লোকই গ্রামের লোক ধরিয়া বেগার খাটায়। তাও আবার যত ছোট লোকেরাই পুলিসের কাছে বেগার দেয়। আর আজ কিনা দারোগা বাবুকেই এ লোকটা বেগার দিতে বলিতেছে। আস্পর্দ্ধাত কম নয়? এই ভাবিয়া তিনি তখন তাঁহার সেই রুধিরাক্ত আঁখিযুগলের তীব্র কটাক্ষবান নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"কী, আমি গিয়া বেগার দিব? এখানে কি আর লোক পাওয়া

গেলনা?” দারোগাবাবুকে অকস্মাৎ অগ্নি-অবতার হইতে দেখিয়া পূজারী-ঠাকুর ত বিস্ময়ে অবাক! নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া এমন কি অপরাধ করা হইল তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেননা। এদিকে দারোগা বাবুর হুঙ্কার শুনিয়া থানার পুরাতন কনেষ্টবল হরিসিং ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। কিন্তু দারোগাবাবুর কাছে আসিয়াই দেখিল সম্মুখে রঘুনাথ জিউর বাড়ীর পূজারী-ঠাকুর ব্যতীত সেখানে অপর আর কেহই নাই। হরিসিং তখন দারোগাবাবুর এই অকস্মাৎ ক্রোধের কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইলনা। পরে পূজারী-ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—‘পায় লাগি ঠাকুর, নিমন্ত্রণ করতে আইছেন বুঝি? তো বেশ ভালোই হইলো। কয় রোজ খাওয়ার বড়ই তকলিপ হইলো। হাম লোক সব আদ্‌মি বেগার দিতে যাইবো। দারোগা বাবুকেও কহিছেন তো?”

হরিসিংএর কথায় দারোগা বাবুর খট্‌কা বাঁধিল। তিনি তখন মনে মনে ভাবিলেন, ঠাকুর কি তা হলে কোনও অপমানজনক কথা বলে নাই? তবে ‘বেগার দিবেন’ একথাই বা কেন বলে? তারপর হরিসিংকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিলেন যে রঘুনাথ জিউর বাড়ীতে ‘বেগার দেওয়ার’ অর্থ ভোগের প্রসাদ পাওয়া, তখন সেখানে হাসির ধুম পড়িয়া গেল। পরদিন স্বয়ং দারোগা বাবু আপনা হইতেই ‘বেগার দিতে’ গেলেন এবং ভোগের পুরী-পরমান্ন প্রভৃতি নানা উৎকৃষ্ট দ্রব্যে উদরপূর্ত্তি করিয়া পূর্ব্বদিনের ক্রোধের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কেবল অরহর ডালের খিচুড়ীর কথাটা কিছুতেই আর ভুলিতে পারিলেন না।

পরদিন সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণকালী বাবু জমিদার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিলে এই ‘বেগার দেওয়ার’ কথা লইয়া পুনরায় হাসির রোল পড়িয়া

গেল। তখন জানিলেন যে এই রঘুনাথ জিউ নামে বিগ্রহ প্রাচীন কাল হইতে স্থাপিত। তাহার এক প্রকাণ্ড মন্দির ও প্রাঙ্গণযুক্ত বাড়ী আছে এবং তৎসংলগ্ন বিস্তীর্ণ এক বাজার রহিয়াছে—তাহাকেই 'রঘুনাথ বাজার' বলে। রঘুনাথ জিউর সেবার জন্য পৃথক সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে এবং তাহার আয়ও সামান্য নহে। সেদিন কথাপ্রসঙ্গে জীবনবল্লভ বাবুর কলিকাতায় গিয়া কলেজে পড়িবার কথা উঠিলে কৃষ্ণকালী বাবু বিশেষ উৎসাহ দিতে লাগিলেন। আমলা-মোসাহেবদিগের সকল আপত্তি তখন উড়িয়া গেল। সেই দিনই স্থির হইল যে কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া করিবার জন্য পুরাতন গোমস্তা বনমালী দাস তথায় গিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া আসিবে এবং কলেজ খুলিবার পূর্ব্বেই জীবনবল্লভ বাবু কলিকাতা যাত্রা করিবেন।

কলিকাতায় বাড়ীভাড়া স্থির করিয়া দুই সপ্তাহ পরই গোমস্তা ফিরিয়া আসিল। এখন সমস্ত আয়োজন করিয়া শুভদিনে যাত্রা করিলেই হয়। স্থানীয় টোলের অধ্যাপক তর্কালঙ্কার মহাশয় দিন দেখিয়া না দিলে বাড়ীর মেয়েদের কিছুতেই মন উঠেনা। তাই দিন দেখিবার জন্য তাঁহার কাছে গোমস্তাকে পাঠান হইল। তখন গ্রামে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রায় বাড়ী বাড়ী টোল ছিল এবং তাহাতে নানা স্থান হইতে আগত ছাত্রগণ সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিত। মাদুরের উপর বসিয়া অধ্যাপক ও ছাত্র সকলে মিলিয়া শাস্ত্রালোচনা চলিত এবং আনন্দকোলাহলে তাঁহাদের সময় অতিবাহিত হইত। তর্কালঙ্কার মহাশয় একজন বিচক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, অতি সদাশয় ও অমায়িক লোক ছিলেন। ইনি স্মৃতি, ন্যায় এবং বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে 'তর্কালঙ্কার' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার আচার-নিষ্ঠা দেখিয়া গ্রামের ইতরভদ্র সকলে তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি

করিত। স্থানীয় জমিদারবাবুরাও সকল কার্য্যে তাঁহার উপদেশ লইয়া চলিতেন।

সে সময়ে কলিকাতা যাইতে হইলে নৌকাযোগে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত গিয়া তথায় রেলগাড়ীতে চড়িতে হইত। বল্লভপুর হইতে গোয়ালন্দ যাইতে নৌকায় এক সপ্তাহ কাল লাগিত। যাওয়ার দিন স্থির হইলে ছোট বড় দুইখানা নৌকা ঠিক করা হইল—একখানা ভাওলিয়া এবং অপর খানা পান্সী নৌকা। ভাওলিয়াতে জীবনবল্লভ বাবু নিজে ও তাঁহার প্রিয় ভৃত্য বাঞ্ছারাম এবং অপর নৌকা খানিতে রন্ধনের আসবাব, পাচক ঠাকুর, গোমস্তা বনমালী এবং একটী ভৃত্যের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

চার

নব সভ্যতার আলোক

ডাক্তার প্রাণতোষ মজুমদার কলিকাতার নামজাদা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। তিনি একজন সেকালের ডাফ কলেজের ছাত্র। প্রাচীনের ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশপ্রান্তে যখন ইংরাজি শিক্ষার নব আলোক-উদ্ভাসিত পাশ্চাত্যজ্ঞানের প্রখর রশ্মিপাতে এক নবজাগরণের সূচনা করিল তখন মেঘবিমুক্ত রবিকরদীপ্ত তীব্র জ্যোতিতে আবরিত-পল্লব আঁখিযুগল অকস্মাৎ উন্মোচিত হইলে যেমন দৃষ্টিশক্তি বিভ্রান্ত হয় তেমনি সেই নবাগত শিক্ষাপ্রভাবে নবীন যুবকবৃন্দের চক্ষু একেবারে ঝল্‌সাইয়া গেল! তখন যাহাকিছু প্রাচীন তাহাকেই অনাস্থা ও বর্জ্জন, এবং অপরদিকে অপরিজ্ঞাত অপরীক্ষিত হইলেও যাহা কিছু নবীন তাহাকেই সম্ভাষণ ও বরণ এই ভাবের প্রবাহে প্রাচীন ধর্ম্ম ও প্রাচীন রীতিনীতি পরিত্যাগ করিয়া যুবকদিগের একদল নবপ্রচারিত খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিল এবং অনেকে সর্ব্ববিষয়ে আস্থাহীন হইয়া একেবারে নাস্তিক ও অনাচারী হইয়া পড়িল। আবার অনেকে 'ন যযৌ-ন তস্থৌ' হইয়া রহিল। ইহারাই তখনকার একরূপ 'উদার-পন্থী'—অর্থাৎ ইহারা ধর্ম্মে সনাতন হিন্দু এবং কর্ম্মে নব্যের বন্ধু। কাজেই 'খানাপিনা' সকল বিষয়ে ইহারা উদার—ধর্ম্মকর্ম্মেও যেমন অরুচি নাই, খাদ্যাখাদ্যেও তেমনি অরুচি নাই। ডাক্তার প্রাণতোষও পাঠ্যাবস্থায় কতকটা এই শেষোক্ত শ্রেণীর ছিলেন।

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে যখন দেশ তোলপাড় হইতেছে, ঠিক সেই সময়ে প্রাণতোষ কলেজ ছাড়িয়া

চিকিৎসকের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং মেধাবী ছিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন সুচিকিৎসক বলিয়া পরিচিত হইলেন। আর্থিক অবস্থা কোন দিনই তাঁহার নিতান্ত অসচ্ছল ছিলনা। বিলাত হইতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিবেন প্রাণতোষের বহুদিনের অভিলাষ। কিন্তু বিধবা মাতার বিরুদ্ধতায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। যেবার মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন সেইবার লুকাইয়া বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন কিন্তু বোম্বাই হইতে জাহাজে উঠিবার সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হয়। ইহার কয়েক মাস পরই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল এবং তৎপর আর কলেজে পড়া হইল না। বাড়ীতে হোমিওপ্যাথি-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অবশেষে বহু অর্থব্যয় করিয়া এখানে থাকিয়াই আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হোমিও-প্যাথি এম্ ডি, উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হন। পরিবারের মধ্যে তাঁহার পত্নী ও শিশুসন্তানদ্বয় এবং এক বিধবা ভগিনী ও মাতা ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না। তবে বাড়ীর এক বিধবা দাসীও এই পরিবারের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত ছিল। আর তাঁহার পিতার আমলের পুরাতন ভৃত্য ভগীরথকেও সে পরিবারভুক্ত ধরিয়া লওয়া যায়।

সিমলা কাঁসারিপাড়া প্রাণতোষের পৈত্রিক বাটী। আদিম নিবাস নদীয়া জেলার মেহেরপুর গ্রাম। পিতা মুন্সী আশুতোষ মজুমদার মহাশয় দেওয়ানী আদালতের পেস্কার ছিলেন। পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার এমনি অধিকার ছিল যে তাঁহার পার্সী রচনা দেখিয়া বড় বড় মৌলবী সাহেবেরা স্তম্ভিত হইতেন। ইনি প্রাচীন হিন্দুসমাজের লোক হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ উদার ও হৃদয় অতি প্রশস্ত ছিল। শেষ বয়সে নিজের অধ্যবসায়গুণে ইংরাজী বিদ্যাও

শিক্ষা করিয়াছিলেন; সুন্দর লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন এবং উত্তর-প্রত্যুত্তরে কিছু কিছু বলিতেও শিখিয়াছিলেন। পার্সীভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া 'মুন্সী' উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতায় কর্ম্মস্থল, এবং বৎসরের অধিকাংশ সময়ই এস্থানে কাটাইতে হয় বলিয়া কাঁসারিপাড়ায় বাটী নির্ম্মাণ করেন। দেওয়ানী আদালত দুর্গাপূজা উপলক্ষে দীর্ঘকাল বন্ধ থাকে, তাই এই অবকাশের সময় দেশের বাড়ীতে যাওয়া হইত। প্রাণতোষের পাঠ্যাবস্থাতেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পৈতৃক বাসস্থান মেহেরপুরে যেমন বৎসরে একবার করিয়া যাওয়া হইত, পিতার মৃত্যুর পরও সেই ব্যবস্থাই বহাল রহিয়াছে।

প্রাণতোষের মাতুল রণবীর শর্ম্মা একজন অতি তেজীয়ান ও দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন। পটলডাঙ্গার গোলদীঘীর দক্ষিণে এক গলিতে তাঁহার বাড়ী। তিনি একজন বিখ্যাত পেটেণ্ট-ঔষধ প্রস্তুতকারক। এই ব্যবসায়ে তিনি লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ইনি ছিলেন নব্যতন্ত্রের দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক—অর্থাৎ উগ্রপন্থী। অতি স্পষ্ট-বক্তা, সুরসিক এবং অকুতোভয় বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ইহার বিশেষ ভাবছিল। ইনি তাঁহার একজন সহপাঠীও ছিলেন এবং বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি নামেও যেমন রণবীর, কাজেও তেমনি অমিততেজ ও অদম্য উৎসাহী এবং সকলপ্রকার সংস্কারের একজন অগ্রণী ছিলেন। ইঁহারও আদিম নিবাস নদীয়া জেলায়। ঔষধবিক্রয়ের ব্যবসা করিতে আসিয়া কলিকাতায় বাড়ী করিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করেন।

রণবীর ধর্ম্মেরও কোন ধার ধারিতেন না এবং সমাজেরও কোন তোয়াক্কা রাখিতেন না। তিনি যেমন দেবদেবী মানিতেন না, তেমনি কোনও শাস্ত্র—অর্থাৎ বেদ-পুরাণ, কোরাণ-বাইবেল এসকল

কিছুই মানিতেন না। 'খানাপিনা'রও কোনই আচারবিচার ত ছিলইনা, বরং যখন যাহা করিতেন তাহা প্রকাশ্যভাবে করিতেই ভাল বাসিতেন। নব্যদলের কেহ প্রথম যখন নবোৎসাহে মুসলমানের দোকানের পাঁউরুটী কিনিয়া আনিতে যাইতেন তখন যতই দোকানের নিকটবর্ত্তী হইতেন ততই তাঁহার উৎসাহের বেগ কমিয়া আসিত এবং ভিতরে ভিতরে তাঁহার বুক দুর্ দুর্ করিতে থাকিত। কিন্তু রণবীরের এ সকল দুর্ব্বলতা একেবারেই ছিল না। বরং প্রকাশ্যে নিকৃষ্ট দোকান হইতেও 'শিক-কাবাব' কিনিয়া আনিয়া রাস্তায় কিম্বা গোলদীঘীর ধারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সেই সকল অর্দ্ধদগ্ধ মাংস খাইতে দেখা যাইত। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই যে এরূপ করিতেন তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইত। তিনি বলিতেন—"তেত্রিশ কোটি দেবতাকেই যদি তুড়িমেরে উড়িয়ে দেওয়াগেল তবে আবার খৃষ্টকে ভজতে যাব কেন? বাইবেলই যদি অভ্রান্ত বলে মানবো তবে বেদ-কোরাণের অপরাধ হল কি? আর গঙ্গাজলই যদি পবিত্র বলে না মানলুম তবে জর্ডনের জলইবা শুচি বলে মানতে যাব কেন?"

মদ্যপান তখন সভ্যসমাজের একটা নিদর্শন ছিল। স্কুল-কলেজের ছাত্রেরাও তখন মদ্যপান করিত। এক কথায় সাহেবরা যাহা কিছু করে তাহাই নির্ব্বিচারে আদর্শ বলিয়া গণ্য হইত। দেশী নাম বিকৃত করিয়া লিখিবারও তখন এক তীব্র নেশা ছিল। ছাত্রদের হাত হইতে পণ্ডিতের টিকি এবং মৌলবীর দাড়ি বাঁচাইয়া চলিতে হইত। তখন বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট বাঙ্গালাতে চিঠি লেখাও অপমানজনক বলিয়া মনে হইত। ইংরাজিতে চিঠি লেখা এবং দেখা সাক্ষাতে পরস্পর ইংরাজীতে কথা বলা ও ইংরাজীকেতায় অভিবাদন বা কর-মর্দ্দন করাই ভদ্রসমাজের রীতি ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আইন যখন বিধিবদ্ধ হইল তখন রণবীর শর্ম্মা বালবিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহের জন্য রণবেশে আসরে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার দলের লোক সকল বিষয়ে বে-পরওয়া; সমাজের ভ্রুকুটিতে কুণ্ঠিত হওয়া তাঁহাদের কোষ্ঠীতে লেখে নাই। এই উগ্রপন্থীরদলই সর্ব্বাগ্রে একার্য্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তা করিতে লাগিল। আইন পাশ হওয়ার কয়েক মাসের ভিতর ইহাদের বিশেষ উদ্যোগে চারিটি বিধবা-বিবাহ হইয়া গেল। যাঁহারা বিবাহ করিলেন তাঁহাদিগের আত্মীয়স্বজনকর্ত্তৃক তাঁহারা পরিত্যক্ত হইলেন এবং সমাজ তাঁহাদিগকে 'একঘরে' করিল। যদিও যথারীতি হিন্দুশাস্ত্রানুসারেই এই সকল বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে তথাপি সমাজ ইহাকে ঘোর অনাচার বলিয়াই ঘোষণা করিল এবং তাঁহাদের উপর প্রবল সামাজিক নির্য্যাতন চলিতে লাগিল।

সেকালে বিদ্যাসাগর মতে বিধবা-বিবাহ করিয়া অনেককেই ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে। আত্মীয়স্বজনকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ইহাঁরা যখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িতেন তখন 'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগর নিজবুক পাতিয়া তাঁহাদের সকলকে কোলে লইতেন। তাঁহারই আপ্রাণ চেষ্টা ও সুপারিশের জোরে অনেকে 'ডেপুটী'র পদ লাভ করেন। কেহ বা আবার চাকুরীর লোভেই এই ফাঁদে পা দিয়াছিলেন এমনও দেখা গিয়াছে। মাতুল রণবীরের প্ররোচনায় ডাক্তার প্রাণতোষ মজুমদারের বিধবা ভগিনী নীরোদ-বাসিনীকে যিনি বিবাহ করেন তিনিই ইহাদের একজন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইংরাজী শিক্ষার সঞ্জীবনীপ্রভাবে এক নবীনত্বের মোহমদিরায় যখন যুবকবৃন্দের মনে মহাবিপ্লবের সূচনা করিল তখন একদল পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া খৃষ্টিয়ান

পাদরীদিগের বাক্যজালে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। শিক্ষিত যুবকদিগের অনেকেই এই নব উত্তেজনার প্রবাহে গা ঢালিয়া দিল এবং দলে দলে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। এইরূপে কলিকাতার কয়েকটী সম্ভ্রান্ত পরিবার হইতে ভবিষৎ-গৌরব অনেক প্রতিভাবান বিদ্যোৎসাহী যুবক যখন এই আবেষ্টনে পড়িয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিল তখন চারিদিকে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। হিন্দুসমাজের দলপতি প্রাচীনের দল তখন ভাবী বংশধরগণের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া প্রমাদ গণিলেন! ঘরে ঘরে একটা আতঙ্কের ছায়া পরিব্যাপ্ত হইল এবং পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হইবার উপক্রম ঘটিল।

এই সময়ে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের বাড়ী হইতে, রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত-বংশ হইতে এবং শ্যামপুকুরের বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের যে কয়েকটী যুবক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাঁহাদের অনেকের সহিত পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত যুবক প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। খৃষ্টান যুবকদিগের দলে মিশিয়া প্রতুলচন্দ্রকে অনেকদিন ডফ সাহেবের গীর্জ্জায় যাইতে দেখা যাইত। রণবীর শর্ম্মার সহিতও কিছুকাল হইতে ইঁহার আলাপ পরিচয় হয়। গোলদীঘীর ধারে দাঁড়াইয়া 'শিক-কাবাব' খাইতে দেখিয়া তাঁহার নির্ভীকতা ও সৎসাহসে মুগ্ধ হইয়া প্রতুলচন্দ্র আপনা হইতেই তাঁহার সহিত আলাপ করেন।

পূর্ব্ববঙ্গের লোক স্বভাবতঃ তেজীয়ান এবং দুঃসাহসী। রণবীর শর্ম্মার প্রকৃতিও অনেকটা এইরূপ। কাজেই উহাঁদের মধ্যে সহজেই ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হইল। প্রতুলচন্দ্রের বাড়ী ঢাকা জেলার বিক্রমপুর। অতুলচন্দ্র ও প্রতুলচন্দ্র দুই সহোদর বেলিয়াঘাটার এক মহাজন আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া কলিকাতায় পড়িতেন। পাঠ সমাপ্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ অতুলচন্দ্র কয়েকমাস হইল তাঁহার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের

সহিত বিষয়কর্ম্মের চেষ্টায় হায়দ্রাবাদে চলিয়া গিয়াছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা চাকুরীর চেষ্টায় তখনও কলিকাতায় বাস করিতেছেন। বিক্রমপুরের লোক সকলেই প্রায় চাকুরীজীবি। 'ঘরমুখো' বাঙ্গালী বলিয়া যে অপবাদ আছে বিক্রমপুরবাসীদিগের পক্ষে তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে না। চাকুরী বা ব্যবসায় উপলক্ষে ইহারা সুদূর প্রবাসে বা কোনও দুর্গম স্থানেও যাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। বাস্তবিক সর্ব্বত্র ইহাদের গতি এবং বিক্রমপুরনিবাসীদিগের ন্যায় 'প্রবাসীবাঙ্গালী' অতি বিরল।

একদিন রণবীর শর্ম্মা প্রতুলচন্দ্রকে লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সেখানে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে যখন নানা কথা হইতেছিল তখন প্রতুলচন্দ্র তাহাতে অতি উৎসাহের সহিত যোগদান করিলেন এবং তিনি নিজেই যে সে সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইতে প্রস্তুত আছেন এমন ভাবও প্রকাশ করিলেন। সেদিন কথাপ্রসঙ্গে রাত্রি অধিক হইয়া গেল বলিয়া তাঁহারা চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। পরদিন উভয়েই আবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটিতে গেলেন। সেদিন আরো একটু খোলাখুলিভাবে কথা হইল এবং রণবীর শর্ম্মাকে একটী উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করিবার জন্যও অনুরোধ করা হইল। তবে বিধবা-বিবাহ করিবামাত্র স্বজনকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহাকে বিষম বিপন্ন হইতে হইবে; এ অবস্থায় পূর্ব্ব হইতে এবিষয়ে প্রস্তুত হইয়াই আসরে নামা কর্ত্তব্য। কাজেই সর্ব্বাগ্রে ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা হইলেই তিনি নিশ্চিন্ত মনে বিবাহ করিতে পারেন প্রতুলচন্দ্র একথা স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন। একথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষণকাল চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তৎপর তিনি হাসিয়া বলিলেন যে প্রতুলচন্দ্র যদি বাস্তবিকই এমন একটী সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইতে অগ্রসর হন

তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে একটী ডেপুটীগিরী যোগাড় করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত আছেন। এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া প্রতুলচন্দ্র আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং রণবীর শর্ম্মাকে পাত্রী খুঁজিবার জন্য তখন হইতে বিশেষ জেদ করিতে লাগিলেন।

পাঁচ

ডাক্তার-পরিবার

ডাক্তার প্রাণতোষের তখন নূতন পসার। প্রাতে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত এবং বিকালে ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত তাঁহার বাড়ীতে বসিয়া রোগী দেখিবার ব্যবস্থা ছিল। প্রাতে ৯টার সময় এবং বিকালে ৬টার সময় বাহিরের রোগী দেখিতে বাহির হইতেন। কিন্তু অধিকাংশদিনই প্রাতে রোগীর ভিড় এত বেশী হইত যে সে সমস্ত রোগী দেখিয়া শেষ করিতে বেলা ৯টা বাজিয়া যাইত, কোনও দিন বা তাহা অপেক্ষাও অধিক হইত। কাজেই বাহিরের রোগী দেখিয়া বাড়ী ফিরিতেও অনেক সময় ১২টা—১টা বাজিয়া যাইত।

হোমিওপ্যাথি মতে লক্ষণ দেখিয়া রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসা করাই বিধি। প্রাণতোষ একজন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বিচক্ষণ চিকিৎসক। প্রত্যেক রোগীর অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া না জানিয়া এবং বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তিনি কখনই ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন না। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং বিবেকবুদ্ধি এত প্রখর ছিল যে বাড়ীতে যে সমস্ত রোগী চিকিৎসার জন্য আসিয়া থাকে তাহাদিগকে বিনাভিজিটে দেখিতে হয় বলিয়া তিনি কখনই তাহাদিগকে তাচ্ছিল্যের ভাবে দেখিতেন না বা সংক্ষেপে কাজ সারিতে চেষ্টা করিতেন না। ভদ্র-ইতর, ধনী-দরিদ্র, সকলেই সমভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত অবস্থা জানিয়া লইতেন এবং তৎপর প্রয়োজন মত ব্যবস্থা করিতেন। এজন্য অচিরেই চিকিৎসার সুফল ফলিতে দেখা যাইত। এইসকল রোগীর মুখে তাঁহার 'হাতযশের' কথা অবিলম্বে চারিদিকে প্রচারিত হইতে

লাগিল। তিনি যেমনি মিষ্টভাষী তেমনি হৃদয়বানও ছিলেন। গরীব-দুঃখীর বাড়ীতে গিয়া বিনাভিজিটে রোগী দেখিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। পরন্তু কখন কখনও ঔষধ এবং পথ্যের জন্য নিজ হইতে অর্থদান করিয়া আসিতেও দেখা যাইত। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার পসার বৃদ্ধির ইহাও একটী বিশেষ কারণ।

কাঁসারি পাড়ার মোড়ে বড় রাস্তার ধারেই যে বাড়ীতে পূর্ব্বদিকের দরজার ডানদিকের দেয়ালে প্রবিষ্ট একখানা মার্ব্বেল-ফলকে নাম খোদাই রহিয়াছে উহাই ডাক্তার প্রাণতোষের বাড়ী। ইহার পূর্ব্বদিকে বড় রাস্তা, দক্ষিণে জোড়াসাঁকো যাইবার গলি এবং পশ্চিম ও উত্তরে অপর বাড়ীর দেয়ালে ঢাকা। বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই দক্ষিণে বামে দুইটী ঘর এবং মাঝখান দিয়া আঙ্গিনায় ঢুকিবার প্রবেশ-পথ। এই পথের দুইদিকে বেঞ্চির আকারে গঠিত ইষ্টক-নির্ম্মিত দুইটী বেদী। আঙ্গিনার পশ্চিমপ্রান্তে দুইখানা ছোট বড় ঘর, দক্ষিণে একখানা লম্বা ঘর ও তৎপর 'গোসল-ঘর'। উত্তরদিকে দরদালান এবং উহার একপার্শ্বে গঙ্গাজলের ঘর ও অপরপার্শ্বে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। উঠানের উত্তর-পশ্চিম কোনে জলের কল ও একটী গোল চৌবাচ্চা। প্রাণতোষের পিতার আমলে ঐ গোল যায়গাটি ছিল একটি পাতকুয়া এবং গঙ্গাজলের ঘরে থাকিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জালায় ভরা গঙ্গাজল। এখন জলের কল হওয়ায় পাতকুয়াটি ভরাট করিয়া উহাকে চৌবাচ্চায় পরিণত করা হইয়াছে। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলেই টানা-বারান্দা এবং দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরের দিকে সারি সারি পাঁচখানা ঘর। পূর্ব্বদিকের ঘরের উপর চারিপার্শ্বে উচ্চ আলিসাযুক্ত খোলা ছাদ। সিঁড়ি বাহিয়া তেতালায় উঠিলেই সিঁড়িঘরের চিলেছাদ এবং তাহার পার্শ্বেই ঠাকুরঘর।

বাড়ীতে প্রবেশ করিতে ডানদিকের কামরাটিই ডাক্তারবাবুর বসিবার ঘর। এখানেই তিনি সকাল-বিকাল রোগী দেখিয়া থাকেন। ঘরে ঢুকিতেই দরজার দুই পাশে দুইখানা ছোট ছোট বেঞ্চ। দরজার বিপরীত দিকের দেয়ালের দুইদিকে দুইটী বেঞ্চের ন্যায় উচ্চ কাঠের বেষ্টনীর উপর স্থাপিত দুইটি সুন্দর কারুকার্য্যময় আলমারী ক্ষুদ্রবৃহৎ পুস্তকে পূর্ণ। ইহার মধ্যস্থলে কিঞ্চিৎ সম্মুখভাগে দরজার দিকে মুখ করিয়া ডাক্তারবাবুর বসিবার মত একটী টেবিল ও একখানা চামড়ার গদিওয়ালা চেয়ার স্থাপিত। টেবিলের বিপরীত দিকে দুইখানা অর্দ্ধ-ভগ্ন ছারপোকা-সমাচ্ছন্ন চেয়ার এবং তাহার পশ্চাতে দুইখানা হাতা-ওয়ালা বেঞ্চ সমান্তরভাবে দুইদিকের দেয়াল সংলগ্ন হইয়া অবস্থিত। সমাগত রোগীদিগের জন্য এইসকল আসন নির্দ্দিষ্ট। টেবিলের উপর দক্ষিণে ও বামে মেহগেনি কাঠের তিনতলা দুইটী ঔষধপরিপূর্ণ বাক্স মখমলের ঘেরাটোপে আবৃত। টেবিলের মধ্যভাগে একটী পিত্তলের মস্যাধার ও দুইটী ময়ূরপাখার লেখনী বিরাজমান। উহার একপার্শ্বে একখানা নোট-বই এবং অপর পার্শ্বে একটী শ্বেতপাতরের কাগজ-চাপার তলায় অনেকগুলি ক্ষুদ্র ভাঁজে কাটা কাগজ চূর্ণ-ঔষধের পুরিয়া প্রস্তুত-কার্য্যে ব্যবহৃত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। পশ্চাতের দেয়ালে ডাক্তারবাবুর পিতার আমলের একটী হ্যামিণ্টনের বাড়ীর বৃহৎ ঘড়ী কালের অটুট গতি রক্ষা করিয়া অক্লান্তভাবে টিক্ টিক্ শব্দে সকলকে সময়ের মূল্য স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ইহার ঠিক নিম্নভাগে একখানা উচ্চ টুলের উপর হোমিওপ্যাথির জন্মদাতা হানিমানের একটী প্রস্তরের অর্দ্ধপ্রতিমূর্ত্তি অবস্থিত রহিয়াছে।

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে প্রাতভ্রর্মণে বহির্গত হওয়া প্রাণতোষের প্রাত্যহিক কাজ। সন্নিকটেই ‘হেদোয়া তালাও।’

প্রতিদিন প্রাতে অর্দ্ধঘণ্টাকাল নিয়মিতভাবে তিনি তথায় বেড়াইতেন। এদিকে তাঁহার বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বেই রোগীর সমাগম হইতে থাকিত। বাড়ীতে ফিরিয়াই একবাটি উষ্ণ বল্কাদুগ্ধ পান করিয়া রোগী দেখিতে বসিতেন। তারপর রোগী দেখা শেষ হইলে স্নানান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বাহিরের রোগা দেখিতে বাহির হইতেন। যাহাদিগের বাটীতে রোগী দেখিতে যাইতে হইবে নোট-বইএ পূর্ব্বেই তাহাদের নামঠিকানা লিখিয়া রাখিতেন এবং পাল্কী চড়িয়া সেই সকল বাড়ী যাইতেন— ঔষধের বড় বাক্সটীও সঙ্গে সঙ্গে চলিত।

ডাক্তার প্রাণতোষের মাতা ক্ষিরোদবাসিনী দেবীও প্রতিদিন প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। ঊষার আলোক দেখা-দিতে-না দিতে সদী গোয়ালিনী কাঁকালে দুধের ভাঁড় লইয়া হাজির হইত এবং "মা ঠাকুরুণ, গা তুলুন" বলিয়া হাঁক দিত। ক্ষিরোদবাসিনী দেবী কোনও দিন তাহার আগেই শয্যাত্যাগ করিতেন, কোনও দিন বা সেই চিরপরিচিত কাংস্যবিনিন্দিত স্বরের ঝঙ্কারে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত। ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে দুধের 'যোগান দিয়া' সেখানেই দুধের ভাণ্ডটী রাখিয়া মা ঠাকরুণের পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে সদীও নিত্য গঙ্গাস্নান করিতে যাইত। মা ঠাকরুণ গঙ্গাস্নানে বাহির হইবার পরই সারদা ঝি ঘরের ঝাঁটপাট শেষ করিয়া আঙ্গিনায় গঙ্গাজলের ছড়া দিত এবং ডাক্তারবাবু ভ্রমণে বাহির হওয়ামাত্র কর্ত্তার আমলের পুরাতন ভৃত্য ভগীরথ নীচের সমস্ত ঝাঁট দিয়া ঝাড়ন হাতে বাবুর বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইত। সে ঘরের আসবাবপত্র ঝাড়পোছ শেষ করিতে না করিতেই দুই একটী করিয়া রোগীর সমাগম হইতে থাকিত। এদিকে সারদা ঝি হাত পা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়াই উনুনে আগুণ দিয়া নীরোদবাসিনীর উদ্দেশে হাঁকিয়া বলিত—"খুকুমণি, বাবুর ফিরবার

সময় হ'ল, দুধজ্বাল হয়ে গেছে।" তারপর উনুনে দুধের কড়া চাপাইয়া নীরোদবাসিনীর অপেক্ষা করিত।

কন্যা নীরোদবাসিনী সাধারণতঃ মাতার সঙ্গেই শয্যাত্যাগ করিতেন। কোনও দিন বা মাতার ঘুম হইতে উঠিবার সাড়া পাইয়াও কিছুকাল পরে উঠিবেন ভাবিয়া আলস্যভরে শুইয়া থাকিতেন। কোনও দিন হয়ত এমনি করিয়া পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িতেন। কিন্তু সারদা ঝির ডাক কাণে যাইবা মাত্র শয্যাত্যাগ করিতে কোনও দিনই বিলম্ব হইতনা। কাজেই দাদা হেদোয়া হইতে ফিরিবামাত্র তাঁহার সম্মুখে দুধের বাটি ধরিতে কোনদিনই ব্যতিক্রম হইত না। কেবল বাড়ীর বধূমাতা সুষমা দেবীই সকলের শেষে শয্যাত্যাগ করিতেন। একে বাল্যাবধি তাঁহার এই অভ্যাস, আবার ছোট শিশু দুইটীর জন্য অনেক সময় রাত্রিজাগরণ করিতে হয় বলিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কিছুতেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত না। তবে শাশুড়ী ঠাকরুণ গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে শয্যাত্যাগ করিতে দেখা যাইত।

সারদার ইতিহাস এখানে কিছু বলা আবশ্যক। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক বিধবা ঝি এই পরিবারের অঙ্গীভূত। সারদাই সেই বিধবা ঝি। সে মজুমদার বাড়ীর ক্রীতদাসীর কন্যা। এ কালের মত তখন ঠিকা ঝি চাকর ছিলনা। সেকালে গোলাম ও দাসী কেনা-বেচা চলিত। ইহা হইতেই 'কেনা গোলাম' কথার উৎপত্তি। প্রাণতোষের পিতামহ সারদার মাতা মোক্ষদাকে কুড়ি টাকায় কিনিয়াছিলেন। দেশে সেবার দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দেখা দিয়াছিল। খাইতে না পাইয়া লোক ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। তখন নিজের মা-বোন ও স্ত্রীকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। এমন কি কত লোক পুত্রকন্যাকে বিলাইয়া দিতে পারিলেও রক্ষা পাইত। তা ছাড়া মুসলমান আমলের

শেষ সময় পর্য্যন্ত এই ক্রীত দাসদাসীর রীতিমত ব্যবসা চলিত। এই সব দাসীরা একেবারে পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িত। ইহাদের ছেলেমেয়ে হইলে অনেকস্থলে বাড়ীর অপর ছেলেমেয়েদের সহিত উহারা সমভাবে লালিত-পালিত হইত। এই দাসী-কন্যাদিগের বিবাহও হইত। কিন্তু তখনও তাহারা সেই বাড়ীতেই পূর্ব্ববৎ বাস করিত।

কুলীন ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ক্রীতদাসদিগের মধ্যে একদলের ক্রীতদাসী বা তাহাদের কন্যাদিগকে বিবাহ করাই ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঠিক কুলীন ব্রাহ্মণের ন্যায় ইহারাও কেহ ১০।১৫ বা ততোধিক বিবাহ করিত এবং পালাক্রমে স্ত্রীদিগকে সময় সময় দেখিতে যাইত। তাহারাও কুলীন ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় স্ত্রীর কাছে অর্থের দাবী করিত এবং প্রত্যেক স্থান হইতে এইরূপে টাকা সংগ্রহ করিয়া বেড়াইত। ইহাই তাহাদের একমাত্র জীবিকাস্বরূপ ছিল। মোক্ষদাকে যখন মজুমদার মহাশয় কিনিয়া আনিলেন তখন তাহার ভরা যৌবন। শীঘ্রই তাহাকে ওইরূপ এক বিবাহ-ব্যবসায়ীর সহিত বিবাহ দেওয়া হইল। তাহার নাম ছিল দশরথ। পূর্ব্ববঙ্গে তাহার দেশ। সে ছমাস-নমাসে একবার করিয়া আসিত এবং কয়েকদিন ধরিয়া মজুমদার বাড়ীতে থাকিত। তখন কুলীন জামাতার মতই তাহাকে আদর করিতে হইত। পরে মোক্ষদার এক কন্যা হইবার কয়েক বৎসর পরই দশরথের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়।

মোক্ষদার সন্তান হইলে তাহার আর আদরের সীমা ছিলনা। গৃহিণী তাহাকে নিজ কোলে-কাঁকে করিয়া মানুষ করেন। বাড়ীতে হঠাৎ কেহ আসিলে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না যে এ তাঁহার দাসী-কন্যা। প্রাণতোষের পিতামহী আদর করিয়া সে কন্যার নাম রাখিলেন সারদাসুন্দরী। আদরে পালিতা কন্যা বড় হইলেও গৃহকর্ম্মে নিতান্ত

অপটু হইয়া রহিল। যদিও মোক্ষদা এজন্য সর্ব্বদা তাহার কন্যাকে তিরস্কার করিত কিন্তু গৃহিণীর অত্যধিক আদরে তাহাতে কোনও ফল হইত না। তের বৎসর পূর্ণ হইলে বহুচেষ্টায় বিবাহ-ব্যবসায়ী রাম-লোচন নামক এক প্রৌঢ়ের সহিত তাহার বিবাহ হইল।

সারদা অতিশয় 'বাড়ন্ত' ছিল এবং তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব ও লাবণ্য যথেষ্ট ছিল। সুপুষ্ট ও সুডৌল দেহভঙ্গীমায় তাহাকে বয়সের তুলনায় অনেক বড় দেখাইত। আবার বাবুদের বাড়ীতে থাকিয়া তাহার বেশ-ভূষারও বিশেষ পারিপাট্য হইয়াছিল। কাজেই দেখিতে তাহাকে বড় ঘরের মেয়ের মতই দেখাইত এবং তাহার মেজাজটাও অনেকটা সেইরূপই হইয়া পড়িয়াছিল। বিবাহের রাত্রিতেই তাহার মন নিতান্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে তাহার এই আধবুড়া বরের সহিত এক-শয্যায় শয়ন করিতে কিছুতেই রাজী হইতে চাহিল না। মাতার বিশেষ কাকুতি-মিনতি এবং অবশেষে শাসনেও যখন কিছু হইলনা তখন স্বয়ং গৃহিণী আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কত বুঝাইতে লাগিলেন এবং আদর করিয়া কত চুম্বন দিলেন। সারদা তখন হেঁট হইয়া কেবল চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতে লাগিল। অবশেষে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া একজন জোর করিয়াই তাহাকে সে ঘরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া বাহির হইতে দরজার শিকল লাগাইয়া দিল।

সে রাত্রে যাঁহারা বাসর-ঘরের দরজা ও জানালার ফাঁকে আড়ি পাতিয়া ছিলেন তাঁহারা বলেন সারদা ঘরে প্রবেশ করিয়াই দরজায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল এবং তাহার চক্ষুদ্বয় দুই হাত দিয়া আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। নববধূ বিদ্রোহীবেশে উপস্থিত হইবামাত্র সহসা তাহার দিকে তাকাইতে অভ্যস্তবর রামলোচনেরও কিছুতেই সাহস হইল না। সে এতক্ষণ নববধূর আগমন অপেক্ষায় ছটফট করিতেছিল। যদিও ইহা

তাহার দ্বাদশ অধ্যায়, কারণ ইতিপূর্ব্বে সে এগারটি নিরীহ প্রাণীর পাণি-পীড়ন করিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কেহ বা যৌবনসীমা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ত্বে পা বাড়াইয়াছে, কেহ বা এখনও পূর্ণ যুবতী, তথাপি কেহই এমন মনোমোহিনীরূপে তাহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। এস্থলে সে আর ব্যবসায়ী নয়—কিন্তু প্রণয়ী। তাই উৎফুল্ল হৃদয়ে দীর্ঘ-কাল অপেক্ষার পর নিতান্ত হতাশ মনে সে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এঅবস্থায় কিছুতেই সে স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। বালিশের উপর কনুইয়ের ভর দিয়া অর্দ্ধউত্তোলিত অবস্থায় হস্তের উপর মস্তকন্যস্ত করিয়া উৎকর্ণভাবে নব প্রণয়িণীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। এ অবস্থায় হঠাৎ তাহাকে সেখানে দাঁড়াইতে দেখিয়া রামলোচন একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল!

ইতিমধ্যে ঠেলাঠেলিতে সারদার বসনাঞ্চল ও কবরীবন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল। দরজায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইতে গিয়া তাহার অবগুণ্ঠনও শিথিল হইয়া স্কন্ধের উপর ঝুলিয়া পড়িল এবং বুকের বসনও কথঞ্চিৎ উন্মোচিত হইল। তখন তাহার সেই আধ-আবরিত আধ-মুকুলিত মোহিণী রূপরাশি দেখিয়া রামলোচনের মনে প্রলয় উপস্থিত হইল! তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ তখন ভাঙ্গিয়া গেল—সে হঠাৎ এক লাফে সারদাকে বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে প্রয়াস পাইল। এই আকস্মিক আক্রমণে অপ্রতিভ হইয়া সারদা উদ্যত ফণীর ন্যায় গ্রীবাভঙ্গী করিয়া রোষকশায়িত লোচনে চাহিবামাত্র রামলোচন অতি মাত্র বিহ্বল হইয়া নববধূর পদযুগল আশ্রয় করিল। এই মান-ভঞ্জনের পালা দেখিয়া আড়িপাতিনীগণ 'ফিক্' করিয়া উচ্চরবে হাসিয়া ফেলিলেন।

ইহার পর যাহা ঘটিয়াছিল যদিও আড়িপাতিয়া অনেকে তাহা দেখিয়াছিলেন কিন্তু বাসরঘরের গুপ্ত খবর মেয়ে মহলেই আবদ্ধ থাকা

ভাল এজন্য আমরা আর তাহা প্রকাশ করিলাম না। তবে দেখা গিয়াছে যে বিবাহের পর রামলোচন কিছু ঘন ঘনই মজুমদার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিল। আর ইহাও দেখা গিয়াছে যে এখানে তাহার অর্থ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা একেবারেই ছিল না। কিন্তু সে যতদিন এখানে থাকিত সারদার তাহাকে যেন আপদ বলিয়াই মনে হইত। আমরা একথাও শুনিয়াছি যে রামলোচন বধূকে লইয়া স্বতন্ত্র ঘর পাতিয়া বাস করিতে প্রস্তুত ছিল, এমন কি সারদার কাছে প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিল যে সে আর কখনও অপর স্ত্রীদিগের মুখাবলোকনও করিবে না। কিন্তু তথাপি তাহার প্রতি কিছুতেই সারদার কৃপার উদ্রেক হইল না। তাহার পর বৎসর ফিরিতে না ফিরিতেই হঠাৎ একদিন রামলোচনের মৃত্যু সংবাদ আসিয়া চিরদিনের মত সারদার আপদ মুক্ত করিল।

ছয়

গৃহস্থালী

মজুমদার-গৃহিণী ক্ষিরোদবাসিনী দেবীর পিতা তাঁহাকে অষ্টম বর্ষে বিবাহ দিয়া গৌরীদানের ফল লাভ করেন। তখন সম্পন্ন পরিবারেও পাচক ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণীর হস্তে রন্ধনকার্য্যের ভারার্পণ করিবার প্রথা ছিল না এবং একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা বর্ত্তমান থাকায় বাড়ীতে পোষ্য-বর্গের সংখ্যাবাহুল্যও যথেষ্ট ছিল। পুতুল ক্রীড়ারত বালিকা ক্ষীরোদ-বাসিনী যখন খেলার হাতাবেড়ী ফেলিয়া সত্যিকার হাতাবেড়ী ধরিতে নববধূরূপে শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিলেন তখন তাঁহাকে মোক্ষদা ঝি-ই তাহার স্বভাব-সুলভ মমতাময় পক্ষপুটে রাখিয়া সকল কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিল এবং অবসর সময়ে নানারূপে বালিকার চিত্ত-বিনোদন করিয়া স্বজন-বিরহ-বিধুর বেদনাতুর বক্ষে স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রয়োগ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল।

ক্ষীরোদবাসিনী যখন প্রথম শ্বশুরালয়ে আসিলেন মোক্ষদা ঝি তখন পূর্ণ যুবতী। মোক্ষদা দেখিতে কাল কিন্তু কুরূপা নহে। স্বভাবতঃই সে সুশীল শান্ত এবং সকল বিষয়েই তাহার সংযম ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিবার বিধিদত্ত প্রকৃতি। প্রাণটী তাহার মমতায় ভরা। সংসারে চিরদিন উপেক্ষায় লালিত-পালিত বলিয়া অন্যের দুঃখ দেখিলেই যেন তাহার কোমল হৃদয় একেবারে গলিয়া যাইত। ক্ষীরোদবাসিনী শ্বশুরালয়ে আসিবার চারি বৎসর পরে মোক্ষদার এক কন্যা জন্মে। তাহারই নাম সারদা। আকৃতি ও প্রকৃতিতে সারদা মাতার সম্পূর্ণ

বিপরীত। সে দেখিতে ফরসা, গোলগাল-গা এবং উগ্র প্রকৃতির। ইহার উপর সেকালের কর্ত্তাগৃহিণীদের অত্যধিক আদরে তাহার আব্দার অত্যাচার অত্যধিক হইয়া উঠিল। ক্ষীরোদবাসিনীকে ইহার জন্য অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহার প্রতি মোক্ষদার স্নেহ-কোমল ব্যবহারের প্রতিদানে এবং অনেকটা গুরুজনদিগের ভয়ে সারদার সকল অত্যাচার তিনি নীরবে সহিয়া গিয়াছেন।

সারদা জন্মিবার তিন বৎসর পর অর্থাৎ পনর বৎসর বয়সে ক্ষীরোদ-বাসিনী দেবীর প্রথম সন্তান প্রাণতোষের জন্ম হয়। ইহার পর চারিটী সন্তান পর পর নষ্ট হয়। তাহার মধ্যে দুইটী ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা যায় এবং অপর দুইটী মৃত অবস্থায় প্রসব হয়। ক্ষীরোদবাসিনীর এই মৃতবৎসাদোষ দূর করিবার জন্য মোক্ষদা ঝি গোপনে কত টোটকা, কত তুকতাক করিয়াছে, কত উপবাস এবং ঠাকুর দেবতার কাছে মাথা খুঁড়িয়াছে তাহা বলিবার নয়। এই সময়েই সারদার বিবাহ হয় এবং বছর ফিরিতে না ফিরিতেই বিধবা হয়। দেশে থাকিয়া যখন মৃতবৎসাদোষ দূর করিবার কোনও উপায় হইল না তখন মোক্ষদা ঝি বৌমাকে কলিকাতায় নিয়া রাখিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। এদিকে উদ্যতযৌবন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি বিধবা সারদাকেও পল্লীগ্রামে রাখা আর নিরাপদ বলিয়া মনে হইতেছিল না। সেবার পূজার ছুটিতে যখন মুন্সী আশুতোষ দেশে আসিলেন তখন মোক্ষদা ঝি এসকল কথা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বোঝাইল এবং কলিকাতায় পরিবার নিয়া বাস করিবার জন্য এমন জেদ করিতে লাগিল যে তিনি আর সেকথা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সেইবার হইতেই আশুবাবুর কলিকাতায় স্থায়ী বাসের ব্যবস্থা হইল। মোক্ষদা ও সারদা দুই জনই সঙ্গে আসিল কিন্তু এক বৎসর পর দেশের বাড়ীর তত্ত্বাবধানের

জন্য মোক্ষদাকে বাধ্য হইয়া পুনরায় মেহেরপুরে গিয়া বাস করিতে হইল।

কলিকাতায় প্রথমতঃ ঝামাপুকুরে এক বাড়ী ভাড়া করিয়া আশুবাবু সপরিবারে বাস আরম্ভ করেন। অবশেষে সিমলা কাঁসারি পাড়ায় একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া নিজবাটী নির্ম্মাণ করেন। কলিকাতায় আসিয়া ক্ষীরোদবাসিনী দেবীর মৃতবৎসাদোষ দূর করিবার জন্য মোক্ষদা আবার কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। পাড়া প্রতিবেশীদিগের বাড়ীতে, গঙ্গার ঘাটে অথবা কালীতলায় যখন যেখানে গিয়াছে সেখানেই ইহার প্রতীকারের উপায় অনুসন্ধান করিয়াছে। অবশেষে বহু চেষ্টা ও খোঁজের পর সদী গোয়ালিনীর সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হয়। গোয়ালাদিদির টোটকার অব্যর্থ গুণেই হউক অথবা স্বাস্থ্য ও বায়ু-পরিবর্ত্তন জনিত স্বাভাবিক উপায়েই হউক ক্ষীরোদ-বাসিনীর শেষ সন্তান নীরোদবাসিনীর জন্ম হইল। কিন্তু ইহাতে সদী গোয়ালিনীর টোটকার মাহাত্ম্যই বৃদ্ধি পাইল এবং সেই হইতেই সে মজুমদার বাড়ীতে দুধ যোগাইতেছে এবং বাড়ীর গৃহিণীর সহিতও ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হইয়াছে।

ঝামাপুকুরের উত্তরে চালতা বাগানের ঠিক দক্ষিণেই মতিশীলের প্রকাণ্ড দীঘী। এই দীঘীর পূর্ব্ব পারেই গোয়ালা পাড়া। এই পাড়াতেই সদী গোয়ালিনীর বাস। কতকাল ধরিয়া যে সদী এখানে আছে তাহা কেউ জানে না। আর তার বাপ যে আদর করিয়া নাম রাখিয়াছিল 'সৌদামিনী', সে নামেও কেউ তাহাকে ডাকে না। যাহারা এখন বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছে তাহারাও বাল্যকাল হইতেই তাহাকে একই ভাবে বাড়ী বাড়ী দুধ যোগাইতে দেখিতেছে। তাহার পরণে কস্তাপেড়ে শাড়ী, নাকে ফাঁদিনথের বেড়ী। সে এখনও পাকা চুলে সিঁদুর পরে, চলিবার

সময় তাহার হাতের বালা ও বাহুর তাগা কাঁকালের ঘড়ায় লাগিয়া 'টুন্-টুন', 'ঠুন্-ঠুন' বাজিতে থাকে। তাহাকে দেখিয়া পাড়ার ঝি-বউরা হাসিয়া মরে। মুখকাট্‌কিরা জিজ্ঞাসা করে—"হ্যাঁগা, গয়লাদিদি, আমাদের গয়লাদাদা কই?" সদী পাকাচুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে এক গাল হাসিয়া বলে—"সে মিন্সে সেই যে কাশী গেছে আরতো তার ফিরবার নামটি নেই।" শুনিয়া সকলে মুখ টিপিয়া হাসিত। যুবতীরা বলিত—"গয়লাদিদিগো, আমরা ত জন্মে কখনও গয়লাদাদাকে দেখলুম না, কবে সে কাশী গেল?" উত্তরে সদী বলিত—"আঃ মরণ! সে কথা আর বলোনা দিদি সকল। এই কত বছর গেছে সে হিসাব কি আমার মনে আছে গা? তা দুই কুড়ির কম কি আর হবে?" সকলে তখন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিত। পরিহাস প্রিয়া যুবতারা বলিত—"রাখাল মান করে বুঝি গোকুলে গেছেন, তা, রাইকে তার এখনও মনে পড়ে না?" বৃদ্ধারা আড়ালে বলিতেন—"আর বল কেন ওকথা; মাগীর ভাতার নেই তবু কপালে সিঁদুর পরা চাই, নাকে বেশর দোলান চাই; মরণ আর কি?" তা হলে হয় কি—সদীর মন ছিল সাদা। সে পাড়ায় পাড়ায় দুধ যোগাইত আর কাহার কোথায় কি আপদ বিপদ ঘটিল তাহার খবর লইত এবং সকলের হাসিকান্নায় যোগ দিত। দুঃখের দিনে দুই ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিতেও কসুর করিত না। এ ছাড়া সদীর আর এক মহা বিদ্যা ছিল। সে অতি ভাল ভাল টোটকা জানিত। তাহার মুষ্টিযোগের অত্যাশ্চর্য্য ও আশুফলপ্রদ গুণ দেখিয়া অনেক সময় অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণও অবাক হইতেন। পাড়ার গরীব দুঃখী প্রতিবেশীদের ত কথাই নাই, সময় সময় শিক্ষিত ভদ্রঘরের ঝি-বউরা ও তাহার মুষ্টিযোগের আশ্রয় লইতেন। রোগী দারুণ যাতনায় অস্থির হইতেছে, চিকিৎসকগণের শত চেষ্টাতেও কোনই

উপশম হইতেছে না, এমন অবস্থায় সদীর টোটকার গুণে যাদুমন্ত্রের ন্যায় সে যাতনার অবসান হইতে দেখা গিয়াছে।

নীরোদবাসিনী জন্মিবার এক বৎসর পরই মোক্ষদাকে শহরের আবদ্ধ বায়ু এবং ইষ্টক-প্রাচীরবেষ্টিত আকাশের নিরুদ্ধ গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় মুক্তাকাশতলে পল্লীর শ্যামল ছায়া-শীতল ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইতে হইল। দেশের বাড়ীতে আসিয়াও মোক্ষদার প্রাণটা কলিকাতায় পড়িয়া রহিল। সে প্রাণতোষকে বাস্তবিকই প্রাণতুল্য ভালবাসিত। সে-ই তাহাকে ছেলেবেলায় অতি যত্নে মানুষ করিয়াছে, কাজেই তাহার স্নেহপ্রবণ প্রাণ স্বভাবতঃই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইত এবং নিজের সন্তান অপেক্ষাও তাহাকে ভালবাসিত। সে নীরোদ-বাসিনীকে কোলে কাঁকে করিয়া মানুষ করিতে পারিল না বলিয়া কত আক্ষেপ করিত।

এখানে নীরোদবাসিনীকে তত্ত্বাবধান করিবার ভার পড়িল সারদার উপর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সারদার চালচলন আকৃতি-প্রকৃতি সমস্তই তাহার মাতার বিপরীত। মায়ামমতা বলিয়া যে একটা প্রাণ জুড়ান পদার্থ আছে তাহা তাহার মোটেই যেন জানা ছিলনা। আত্মীয় স্বজনের স্নেহভালবাসা, শিশুদিগের আনন্দ-কল্লোল বা আধ-আধ বুলির লালিত্য এবং তাহাদিগের আদর-আব্দার এ সকল কিছুতেই তাহার মনে দাগ বসিত না। গাছপালা, বাড়ীঘর, পরিবারপরিজন, গৃহপালিত জীবজন্তু এ সকল কোনও কিছুর প্রতিই যেন তাহার একটা প্রাণের টান ছিলনা বা ইহাদের কোন স্মৃতিও তাহার মনে জাগিত না। আত্মসুখ ছাড়া সে অন্য কিছুই বুঝিত না। নীরোদবাসিনীকে সে কোলে-কাঁকে করিয়া খাওয়াইয়া পরাইয়া অতটুকু হইতে এতটা বড় করিয়াছে বটে, প্রাণ-তোষের পুত্রকন্যাকেও সে কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে সে

কথাও ঠিক। কিন্তু সবই যেন একটা শুষ্ক কঠোর কর্ত্তব্যের দায়ে—প্রাণের টান তাহাতে এক বিন্দুও ছিলনা। অপরদিকে মোক্ষদা আমরণ প্রাণতোষকে সমগ্র হৃদয়-মন ঢালিয়া কি ভালই যে বাসিয়াছে—বৃদ্ধ বয়সেও চক্ষের জল ফেলিয়া তিনি সে কথা সকলকে বলিয়া কতই না তৃপ্ত হইতেন।

সাত

বৈধব্য-দশা

দশ বৎসর বয়সে নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে নীরোদবাসিনীর প্রথম বিবাহ হয়। বিবাহের পর দিবস বরযাত্রীর দল নবোঢ়া কন্যাকে লইয়া নৌকাযোগে বাড়ী আসিতেছিলেন। তখন বৈশাখ মাস, বৈকালের দিকে প্রায় প্রতিদিনই আকাশে কাল মেঘের উদয় হয়। সে সময়ে জলপথের যাত্রীদিগের 'কাল-বৈশাখীর' ভয় সর্ব্বদা মনে জাগে। তজ্জন্য ঝড় জলের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে নিতান্ত ত্বরা করিলেও যাত্রাকালে স্ত্রী-আচার শেষ হইতে অনেকটা বিলম্ব হইয়া পড়িল। তথাপি তাঁহারা যথেষ্ট সাবধানতার সহিতই নৌকাপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধি খণ্ডন করে কাহার সাধ্য? কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর দেখিতে না দেখিতে আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে একখণ্ড কাল মেঘের সঞ্চার হইতে দেখা গেল এবং কিয়ৎকাল পরই প্রবল বেগে বায়ু বহিতে লাগিল। মাঝিগণ ঝড়ের লক্ষণ দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই নৌকারক্ষা করিতে বিশেষ যত্নবান হইয়াছিল কিন্তু কার্য্যকালে সকল চেষ্টাই বিফল হইল। প্রবল ঝড়ের বেগে অচিরেই নৌকাখানি আরোহীসহ জলমগ্ন হইল।

নৌকায় বরকন্যা ব্যতীত বরের পিতা ও খুল্লতাত, দুইভ্রাতা, এক ভগ্নিপতি ও কন্যার এক মামাত ভাই, এক বৃদ্ধা দাসী এবং বরপক্ষীয় পুরোহিত ও প্রামানিক, আর একমাঝি ও দুই মাল্লা, সর্ব্বসমেত এই চৌদ্দটী লোক ছিল। বৈশাখ মাসে এত বৃষ্টিপাত হয় না যাহাতে

নদীর জল কানায় কানায় পূর্ণ হয়। গ্রীষ্মের খর রবিতাপে গড়াই নদী তখন ক্ষীণকলেবরা। স্থানে স্থানে বিস্তৃত চড়া পড়িয়া তাহাতে ঝাউ বা কাশবনে ছাইয়া ফেলিয়াছে! কোন কোনও বালুময় ক্ষুদ্রচড়া নূতন বারিপাতে জলমগ্ন হইবার উপক্রম করিতেছে। ভাদ্রমাসের ভরা নদী না হইলেও গড়াই নদীতে তখনও যতটুকু জল আছে তাহা নিতান্ত অগভীর নয়। ঝড়ের প্রবল আঘাতে সে জল উদ্দাম নৃত্যে আস্ফালন করিতে লাগিল এবং সেই ক্ষিপ্ত তরঙ্গমালায় অতি সুদক্ষ মাঝিও নৌকা স্থির রাখিতে সমর্থ হইল না।

নৌকায় অবস্থানকালেও বরকন্যার বস্ত্রাঞ্চল গ্রন্থিবন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তরী যখন জলমগ্ন হইল তখন মাঝি-মাল্লা ব্যতীত অপর সকলে ছইয়ের ভিতরে বসিয়াই আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। অকস্মাৎ সকলে জলগর্ভে পতিত হওয়ায় ঝটিকার প্রলয় গর্জ্জন ভেদ করিয়া যুগপৎ একটা করুণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়া পরক্ষণেই সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গেল! তখন উত্তালতরঙ্গের কল্লোলোচ্ছাস ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না। তৎপর নিমজ্জিত ব্যক্তিগণের ঝটাপটিতে প্রমত্ত জলরাশি উদ্বেলিত হইতে লাগিল। সন্তরণপটু মাঝিমাল্লাগণ মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল এবং সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া তীরে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এই নিদারুণ দুর্দ্দৈব ঘটনার বিস্তৃত কাহিণী বিবৃত করিয়া পাঠক পাঠিকাগণের করুণ চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। সংক্ষেপে এইটুকু বলিয়াই শেষ করিতেছি যে এই শোকাবহ দুর্ঘটনার ফলে বর স্বয়ং, দশ বৎসর বয়স্ক বালক—বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এবং বৃদ্ধা ঝি—এই তিনটি প্রাণীর বিনাশ ঘটিল। কন্যাকে এক ঝাউবনের ভিতর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া গেল। তখনও তাহার বসনাঞ্চলের সহিত

বরের উত্তরীয় বস্ত্র গ্রন্থিবন্ধন অবস্থায় সংবদ্ধছিল এবং উহাই ঝাউ গাছে আটকাইয়া যাওয়াতে বালিকাকে প্রবল স্রোতের প্রবাহ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। যখন তাহাকে তীরে তোলা হইল তখন একেবারে মৃতবৎ প্রতীয়মান হইল। তৎপর বহু চেষ্টাতেও যখন তাহার সংজ্ঞা-লাভ হইল না তখন সকলে তাহাকে মৃতজ্ঞানে পরিত্যাগ করাই সঙ্গত মনে করিল। ইহা দেখিয়া বলিষ্ঠদেহ কোমলপ্রাণ টেপু মাঝি ছুটিয়া আসিয়া বালিকার মৃতদেহ মস্তকের উপর তুলিয়া লইল এবং দুই হস্তে তাহাকে শূন্যে তুলিয়া উল্টাপাকে ঘুরাইতে লাগিল। কিছুকাল এরূপ করিবার পর বালিকার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তখন তাহাকে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের এক বাটিতে লইয়া গিয়া ক্রমাগত সেকতাপ দিতে দিতে ক্রমে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল।

পরদিন যখন এই হৃদয়বিদারক করুণ কাহিণীর সংবাদ মজুমদার বাড়ীতে পঁহুছিল তখন সে গৃহে কিরূপ হাহাকার উত্থিত হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। সেই নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণে ক্ষীরোদবাসিনী দেবী একেবারে শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। বরের মাতা সে ভীষণ আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া একবারে উন্মাদিনী হইলেন। দশম বর্ষীয়া কন্যার এই শোচনীয় অকালবৈধব্যের কথা ভাবিয়া নীরোদ বাসিনীর পিতার মন অশান্তিতে পূর্ণ হইল। বালিকা নিজেও কেমন হতভম্ব হইয়াগেল—তাহার যে কি সর্ব্বনাশ হইয়া গেল সে তাহা সম্যক ধারণা করিতেও পারিল না। কেবল ঝড়ের সেই প্রলয়ঙ্করী অভিনয়ের কথা মনে করিয়া কেমন একটা অব্যক্ত বিষাদে তাহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল।

এই আকস্মিক দুর্দৈবের আঘাতে মুন্সী আশুতোষের শরীর এক-বারে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং বৎসর ফিরিতে না ফিরিতেই সকল বন্ধন

ছিন্ন করিয়া একদিন তিনি চির শান্তিধামে চলিয়া গেলেন। একে বালবিধবা একমাত্র কন্যার দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর অন্তর অহরহঃ যাতনায় দগ্ধ হইতেছিল তাহার উপর নিজের এই বৈধব্য-দশা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে একেবারে শয্যাশায়িনী করিয়া ফেলিল। এ আঘাত সামলাইতে তাঁহার অনেকদিন লাগিয়াছিল। কন্যার সম্মুখে সদ্দৃষ্টান্ত স্থাপনোদ্দেশ্যে পূর্ব্ব হইতেই তিনি আহার-বিহার সকল বিষয়ে সংযমী হইয়া চলিতেছিলেন, এক্ষণে বিধবার নিয়ম-নিষ্ঠাসকল আরো কঠোরভাবে অবলম্বন করিলেন। নানা ব্রত উপবাস এবং নিত্য পূজার্চ্চনায় রত থাকিয়া মনকে কঠোর বৈরাগ্যব্রতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

সারদাকে দেখিলে বিধবা বলিয়া বিশেষ বোঝা যাইত না। কারণ সে পাড়ওয়ালা কাপড় পরিত, দুই বেলা আহার করিত, বিনুনি করিয়া চুল বাঁধিত, হাতেও তাহার দুইগাছা গালার চুড়ি শোভা পাইত। অবশ্য এ সকল সেকালের গৃহিণীর অমতে চলিত তাহা নয়। তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় বালিকার কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত হইত—ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। প্রথম প্রথম পল্লী-মহিলা-সমাজের অধিনায়িকা এবং সকল প্রকার আচার-নিষ্ঠার ব্যবস্থাকারিণী মৈত্র-গৃহিণী সারদার এই অনাচারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। অবশেষে মনে মনে ভাবিলেন দাসীকন্যার পক্ষে এসকল বিষয়ে অনাচার কতকটা উপেক্ষা করিলেও চলে। কিন্তু ক্ষীরোদবাসিনীর মর্ম্মান্তিক অকাল-বৈধব্যে বালিকার প্রতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিতে গিয়া শুচিনিষ্ঠানিরতা মৈত্র-গৃহিণীও আপনা হইতেই একটু শিথিলতার প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। বোধ হয় এই আকস্মিক দুর্দৈবে তাঁহার কর্ত্তব্যকঠোর শুষ্ক মনেও কেমন একটা চাঞ্চল্যের আবির্ভাব হইয়াছিল।

শ্রাদ্ধকার্য্যাদি সম্পন্ন হইবার কয়েক মাস পর সকলে আবার কলিকাতার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া ক্ষীরোদ-বাসিনী নিজে যেমন কঠোর নিষ্ঠাচার আরম্ভ করিলেন কন্যাকেও তেমনি শিক্ষা দিতে সচেষ্ট হইলেন। একদিন কলেজ হইতে ফিরিবার পর প্রাণতোষ বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই দেখিলেন সাদা থানপরা একটী বালিকা বারান্দার রেলিংএ ঠেস দিয়া বসিয়া আছে, সম্মুখে বসিয়া সারদাঝি পানের ডাবর হইতে একটা করিয়া পান তুলিতেছে আর শির ফেলিয়া তু-চির করিয়া একটা রেকাবের উপর রাখিতেছে। পাশেই একটা ডিবার ভিতর শুপারি কাটা রহিয়াছে এবং অপর দুইটী পিত্তলের পাত্রের একটীতে চূণ ও খয়ের গোলা রহিয়াছে। বালিকা পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল এবং ডান হাতে ছিন্নশির পানের বোঁটাগুলি অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করিতেছিল। হাতের যতটুকু দেখা যাইতে-ছিল তাহাতে প্রাণতোষ বুঝিলেন বালিকাটী সম্পূর্ণ নিরাভরণা। অপরিচিতা বালিকার সঙ্কোচের আশঙ্কায় তিনি তখন বারান্দার অপর দিক হইতে মাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেখানে গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল!

মাতা ক্ষীরোদবাসিনী কঠোর কর্ত্তব্যে মন বাঁধিয়া কন্যাকে সম্পূর্ণ নিরাভরণা করিয়া থান-কাপড় পরাইলেন। নীরোদবাসিনী স্বভাবতঃই অতি শান্ত প্রকৃতির এবং মাতৃগত-প্রাণা। অতি শিশুকাল হইতে মাতা যখন যাহা বলিয়াছেন সে তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে তাহা করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও সে মাতার অবাধ্য হয় নাই। যখন সে পুতুল ক্রীড়ায় একেবারে নিমগ্ন থাকিত তখনও মাতার আহ্বান কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে খেলার সামগ্রী সকল তদবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ মাতার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে। সে স্বভাবতঃই অতিশয়

কোমল-প্রাণা এবং কষ্ট-সহিষ্ণু ছিল। অসহ্য রোগযাতনায় অধীর হইলে তাহার মাতা যখন গায়ে হাত বুলাইয়া শান্ত হইতে বলিতেন তখনই সে একবারে চুপ করিয়া যাইত। চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেলেও মুখ ফুটিয়া সে যন্ত্রণা প্রকাশ করিত না। আজ যখন স্নানের পর মাতা তাহাকে থান-কাপড় পরিতে বলিলেন এবং অঙ্গের একমাত্র অবশিষ্ট আভরণ হাতের দুই গাছি অতি সরু রুলি খুলিয়া ফেলিতে বলিলেন তখন সে অম্লানবদনে তাঁহার আদেশ পালন করিল—একবার প্রশ্নও করিল না বা কোনপ্রকার অনিচ্ছাও প্রকাশ করিল না।

কন্যার এই নব বৈধব্য-বেশ এবং তাহার এই নির্ব্বাক আত্ম-সমর্পনের ভাব দেখিয়া মাতার মন একেবারে উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে দৃশ্য হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তিনি তাহাকে সারদার কাছে যাইতে বলিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা ভেজাইয়া দিলেন এবং কম্পিত দেহে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার সকল ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল এবং বুক-ফাটা অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করিতে লাগিলেন। তাহার পর মনকে কত করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, কত কঠোর প্রতিজ্ঞায় নিজকে বাঁধিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সেই বিক্ষুব্ধ মনকে প্রশমিত করিতে পারিলেন না। কতক্ষণ যে এই ভাবে কাটিল তাহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না। অবশেষে শয্যায় বসিয়া যুক্তকরে সেই দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায় বিশ্বেশ্বরের চরণে মনো-বেদনা জানাইয়া বল ভিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং দরবিগলিত অশ্রু-ধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিতে লাগিল। ঠিক এই সময়ে প্রাণতোষ কলেজ হইতে আসিয়া মাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন।

প্রাণতোষ যখন সকল কথা জানিতে পারিলেন তখন মাতাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে উহার বৈধব্যবেশ ধারণের

কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ যে বিবাহ হইয়াছে উহার পক্ষে ইহা বিবাহই নয়। বলিতে গেলে বিবাহের সকল আচার গুলিও তখন পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই। তা ছাড়া স্বামী বলিতে কি জিনিস তাহা জানিবার ও বুঝিবার মত তাহার সময় বা সুযোগও ঘটে নাই। এ অবস্থায় উহাকে পুনরায় বিবাহ দিতেই হইবে। পুত্রের কথা শুনিয়া মাতা প্রথমে শিহরিয়া উঠিলেন! কিন্তু ক্রমে পুত্র যখন বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রীয় যুক্তিসকল বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন এবং এ বিষয়ে বৃদ্ধা বিদ্যাসাগর-জননীর প্রবল উৎসাহদানের কথা এমন আবেগভরে বর্ণনা করিলেন যে মাতার মনে তখন এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। তিনি নীরবে সমস্তই শুনিয়া গেলেন, নিজে কোনও প্রতিবাদ বা মতামত প্রকাশ করিলেন না; কেবল বুক-ফাটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত যেন এক নূতন ভাবের আবেশে আচ্ছন্ন হইল।

ঘটনাক্রমে ঠিক সেই দিন সন্ধ্যাকালে রণবীর শর্ম্মাও ভগ্নীর সহিত দেখা করিতে আসিয়া প্রাণতোষের মুখে সকল ঘটনা অবগত হইলেন। তিনি এ বিষয়ে একজন বিশেষ অগ্রণী সে কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রণবীর তখন ভগ্নীকে কাছে বসাইয়া এমন তেজের সহিত এ বিষয়ে সমাজের নির্ম্মম ব্যবহার ও অত্যাচারের কথা বলিতে লাগিলেন যে ক্ষীরোদবাসিনী তাহার কোনও প্রতিবাদ করিতেও সাহসী হইলেন না অথবা বিরুদ্ধে বলিবার মত কোনও যুক্তিও তখন তাঁহার যোগাইল না। চলিয়া যাইবার সময় রণবীর শর্ম্মা ভগ্নীকে বলিয়া গেলেন যে তিনি যেন কখনও আর এমন ছেলেমানুষী না করেন এবং একথাও বলিয়া গেলেন যে 'নীরুর' বিবাহের ব্যবস্থা অতি সত্বরেই তিনি করিবেন আর এ বিষয়ে কোনও প্রতিবাদ বা আপত্তি একেবারেই গ্রাহ্য করিবেন না।

আট

বধূ-নির্ব্বাচন

সে বার অর্দ্ধোদয়-যোগ উপলক্ষে প্রয়াগে বহুযাত্রীর সমাগম হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পর দেশ হইতে বৃদ্ধা মৈত্রী-গৃহিণী প্রমুখ বহু প্রয়াগ-যাত্রী কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। কন্যার জন্য এবং সম্প্রতি মাতার মৃত্যুতে ক্ষীরোদবাসিনীর মন বড়ই ভারাক্রান্ত ছিল। তিনিও তখন যাত্রীদলের সহিত মিলিয়া এই মহাযোগ উপলক্ষে তীর্থ ভ্রমণে যাইবেন স্থির করিলেন। বাড়ীতে সারদাকে সকল তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া তিনি কন্যাকে লইয়া অপর সকল যাত্রীদের সহিত প্রয়াগ-যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের ফিরিয়া আসিতে প্রায় মাসাধিক কাল বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে সুযোগ বুঝিয়া প্রাণতোষ তাঁহার বহুদিনের বিলাত গমনের অভিলাষ পূর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত ভাবিয়া তিনি জননীকে না জানাইয়া সাগর-পারে যাত্রার ব্যবস্থা করিলেন। এবিষয়ে একমাত্র মাতুলই তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন।

ক্ষীরোদবাসিনী যে দিন তীর্থ স্থান হইতে বাড়ী ফিরিলেন ঠিক তাহার পূর্ব্বদিনই প্রাণতোষ কলিকাতা পরিত্যাগ করেন। মাতা যখন বাড়ীতে পা দিয়াই এ সংবাদ শুনিলেন তখন তিনি একেবারে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। কোন্ প্রবোধবাক্যই তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। রণবীর শর্ম্মা ভগিনীর এই অবস্থা দেখিয়া প্রাণতোষকে ফিরাইয়া আনিবার ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তৎপর ক্ষীরোদবাসিনীকে আশ্বাসবাক্য দিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ জাহাজ-আফিসে

গেলেন এবং বহু চেষ্টা ও টেলিগ্রাফ-খরচের পর তাঁহাকে পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইলেন। তখন হইতেই প্রাণতোষের মেডিকেল কলেজে পড়া বন্ধ হইল। তাহার পর কিছুদিন বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার পর মাতুলের বিশেষ উত্তেজনায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষার সূত্রপাত হয়।

বিলাত যাত্রার পথে বোম্বাই হইতে ধরিয়া আনিবার পর হইতেই ছেলের মনের কেমন উড়ো উড়ো ভাব দেখিয়া তাহার মন ঘরের দিকে ফিরাইবার জন্য মাতা ক্ষীরোদবাসিনী ঘরে বধূ বরণ করিয়া আনিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ছেলে নূতন আবহাওয়ার মধ্যে বৰ্দ্ধিত হইয়া উদার মতাবলম্বী হইয়াছে তাহা জননীর জানিতে বাকী ছিল না। তাই একটু শিক্ষিতা 'ডাগর মেয়ে'র খোঁজ করিবার জন্য উপযুক্ত ঘটকী নিযুক্ত করিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর একদিন ঘটকীঠাকরুণ জানবাজারের প্রসিদ্ধ কন্‌ট্রাক্টর প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার সহিত সম্বন্ধের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। বালিকার নাম সুষমা; গৃহকর্ম্মে অতিশয় পটু এবং পাড়ার মিশনারী মেমদিগের স্কুলে বাঙ্গালা লেখা পড়া ও সিলাই শিক্ষা করিতেছে। মেয়েটির গোল-গাল গড়ন, হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এবং দেখিতে অতিশয় সুশ্রী। তবে 'বাড়ন্ত' বলিয়া বয়স অপেক্ষা অধিক বড় দেখায়।

ইহার পর ঘটকীঠাকরুণ একটু চাপাগলায় মা ঠাকরুণের কানে কানে যাহা বলিলেন তাহা প্রকাশ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আমরাও পাঠক-পাঠিকার কানে কানে বলিতেছি যে মেয়েটি দেখিতে এত ডাগর বলিয়াই নাকি অনেক ভাল ভাল যায়গা হইতে সম্বন্ধ উপস্থিত হইলেও শেষকালে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঘটকী ঠাকরুণ একথাও জোর করিয়া বলিতে পারেন যে মেয়েটির সেই নিতম্ব-বিলম্বিত চুলের

রাশি, ফুটন্ত জ্যোৎস্নার মত মধুর হাসি এবং আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষের বিলোল কটাক্ষ যদি একবার কোনও যুবকের চক্ষে পড়ে তাহা হইলে তাহার বক্ষ নিঃসন্দেহ আলোড়িত হইবে এবং শেষটায় তাহাকে বাড়ীতে আসিয়া বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে হইবে ও সারারাত্রি সেই সুখ-স্বপ্ন দেখিতে হইবে।

ঘটকীর কাছে যাহা শুনিলেন তাহাতে এই মেয়েকেই আনিতে হইবে বলিয়া ক্ষীরোদবাসিনী দেবী মনে মনে একরূপ স্থির করিলেন। তবে এ বিষয়ে দাদার পরামর্শ লওয়া নিতান্ত আবশ্যক মনে করিয়া পরদিন রণবীর শর্ম্মাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

তখনকার দিনে এখনকার মত বরের বয়স্যগণ অথবা কোন কোন স্থলে আবার নভেলী ধরণে বয়স্যগণের সহিত বর স্বয়ং আত্মগোপনভাবে উপস্থিত থাকিয়া ভাবী বধূকে সন্দর্শন করিবার প্রথা বর্ত্তমান ছিল না। তবে আজকাল কন্যাদেখার নামে তাহার অগ্নিপরীক্ষার্থ বরপক্ষীয়গণকে এবিষয়ে অনেক সময় যেরূপ নির্লজ্জ ও অভদ্রোচিত অভিনয় করিতে দেখা যায় তাহাতে এই কন্যাদেখার প্রকৃত উদ্দেশ্যেই অনেক স্থলে ব্যর্থ হইয়া থাকে। যাহা হউক সেকালে আত্মীয় অভিভাবকগণ এবং কোনও কোনও স্থলে কুল-পুরোহিত কন্যা দেখিতে যাইতেন এবং তাঁহারা যাহাকে পছন্দ করিতেন তাহার সহিতই বিবাহ হইত, বরের মতামতের কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া কখনও কেহ মনেও করিতেন না। কিন্তু মাতুল রণবীর শর্ম্মা এবং স্বয়ং বর এই উভয়েই নব আলোকপ্রাপ্ত নবীন-পন্থী, কাজেই এক্ষেত্রে ইহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিল।

রণবীর শর্ম্মার ইচ্ছা সদ্যবিধবা ভাগিনেয়ী ক্ষীরোদবাসিনীকে পুনরায় বিবাহ দিবেন এবং ভাগিনেয় প্রাণতোষকেও কোনও বাল-

বিধবার পাণিগ্রহণ করাইবেন। কিন্তু উপস্থিত সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য ভগিনীর নিতান্ত ব্যগ্রতা দেখিয়া তিনি তাঁহার মনের বাসনা চাপিয়া গেলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন যে উপস্থিত ক্ষেত্রে আর বিশেষ পীড়াপীড়ি না করিয়া নীরোদবাসিনীর বেলায় তাঁহার অভিলাষ সিদ্ধ করিবেন। নতুবা এখন এ বিষয়ে অধিক ঘাঁটাঘাঁটি করিলে সে সময়েও হয়ত বিফল মনোরথ হইতে হইবে। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগিনীর এ প্রস্তাবে আর কোনরূপ আপত্তি প্রকাশ করিলেন না। তৎপর কন্যা দেখিবার ভার নিজেই গ্রহণ করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী দেবীকে নিশ্চিন্ত করিলেন।

পরদিন প্রাণতোষের আহারের সময় যখন মাতা পাখা-হাতে কাছে বসিয়া মাছি তাড়াইতে ছিলেন তখন কথায় কথায় পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁরে পানু, তোদের মেডিকেল কলেজের একটী ছেলে যে জানবাজার থেকে তোর কাছে প্রায়ই আসতো—সেই যে রণেন্দ্র—না কি যেন একটা নাম, তুই যাকে 'রণু' 'রণু' বলে ডাক্‌তিস্—সেই ছেলেটীর সঙ্গে দেখা হলে একবার ডেকে নিয়ে আসিস্ তো?"

প্রাণতোষ জবাব দিবার পূর্ব্বেই আবার বলিলেন—"তোর মামা যে বলতেন 'পানু-রণু যেন একটী মানিক জোড়' সে ছেলেটী এখন আর আসে না কেন রে?" প্রাণতোষকে মাতা আদর করিয়া সঙ্ক্ষেপে 'পানু' বলিয়া ডাকিতেন।

মাতার কথা শুনিয়া ভাতের গ্রাস মুখে তুলিতে তুলিতে প্রাণতোষ বলিলেন—"কেন মা, তাকে দিয়ে তোমার কি কাজ?" মাতা তখন একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"তুই আনিস না তাকে, তার কাছে আমার বড় একটা দরকারি কাজ পড়েছে।" তাহার পর মুখের গ্রাস শেষ করিয়াই প্রাণতোষ বলিলেন—"সে আর আসবে কি? আমি

কলেজ ছেড়ে দেবার পর বড় একটা তার কাছে যাই না। আর তা ছাড়া তারও এখন পরীক্ষার পড়া, কাজেই তার তত সময়ও নাই।"

আবার এক গ্রাস মুখে তুলিতে গিয়া প্রাণতোষ বলিলেন—"বেশ, আজ বিকালেই তার কাছে যাব এখন। তা, আমায় বলই না মা, হঠাৎ তার কাছে তোমার এমন কি কাজ পড়ে গেল ?"

মাতা সে কথার কোনও জবাব না দিয়া ছেলের পাতে আর দুই-খানা ভাজা দিয়া বলিলেন—"আচ্ছা পানু, তুই ত জানবাজারে কতবার গিয়েছিস্। সেখানে কণ্ট্রাক্টার প্রিয় চাটুর্য্যের বাড়ী দেখেছিস ?"

ছেলে ভাজা দুই খানা শেষ করিয়া বলিল—"মা, তোমার মোচার ঘণ্টটা আর একটু দাও না। ওটা খেতে বড্ডই ভাল হয়েছে।"

রান্নার প্রশংসা শুনিলে সে তরকারী বেশী করিয়া পাতে দেওয়া মেয়েদের চিরকালের স্বভাব। তায় আবার মায়ের প্রাণ! ক্ষীরোদ বাসিনী সে কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়াই এক খাব্‌লা মোচার-ঘণ্ট আনিয়া প্রাণতোষের পাতে দিলেন।

প্রাণতোষ তখন ঘণ্ট দিয়া ভাত মাখিতে মাখিতে বলিলেন—"প্রিয় চাটুর্য্যের বাড়ীর কথা জিজ্ঞেস করছিলে ? সে বাড়ী আবার দেখি নাই ? রণুদের বাড়ীর সামনেই ত সে মস্ত প্রলয় বাড়ী! লোকটা নাকি টাকাও করেছে অগাধ! তবে ছেলেপুলের মধ্যে এক মেয়ে, স্ত্রীও নাকি অনেক দিন মারা গেছেন। শুনেছি মেয়ের এক বিধবা পিসী আছেন তিনিই মেয়েকে মানুষ করছেন। এও শুনেছি যে মেয়েটা বড়ই আদুরে ; পিসীই নাকি অতিরিক্ত আদর দিয়ে তার মাথা খাচ্ছেন।"

প্রাণতোষ এক নিশ্বাসে একেবারে এতগুলি কথা বলিয়া গেলেন। মাতা চুপ করিয়া সব শুনিতেছিলেন আর মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে তা হলে ছেলের কাছেইত দেখ্‌ছি প্রায় সব খবরই পাওয়া গেল। তার

পর পাতের কাছে এক বাটী দুধ রাখিয়া বলিলেন—"তুই কি তা হলে সেই মেয়েকেও দেখেছিস ?"

মাতার কথায় উৎসাহ ভরেই ছেলে বলিল—"তাকে আবার দেখি নাই ? সে যে মেয়েদের স্কুলে পড়ে।"

মুচকি হাসিয়া মা বলিলেন—"তা, মেয়েদের স্কুলে পড়ে তাতে কি হয়েছে ? সে ত ভালই। তবে তুই তাকে দেখ্‌লি কি করে, আর তাদের এত কথা জানলিই বা কি করে ?"

পাতের ভাত নিঃশেষ করিয়া প্রাণতোষ বলিলেন—"কি করে দেখেছি ? তবে শোন।"

এই কথা বলিতেই মাতা বাধা দিয়া বলিলেন—"রোস্, আগে এক মুঠো ভাত এনে দিই, পাত যে একেবারে খালি।" এই বলিয়াই তিনি উঠিয়া গেলেন। তারপর ভাত আনিয়া ছেলের পাতে দিয়া বলিলেন—"এইবারে বল্।"

প্রাণতোষ—"সে এক মজার কাণ্ড মা। সেদিন বেলা তিনটার সময় কলেজ থেকে বরাবর রণুর সঙ্গে তাদের বাড়ী গেলুম। বাড়ীতে ঢুকতেই রাস্তার উপর বাঁদিকের ঘরটাই হল রণুর পড়বার ঘর। সেখানে বসে দু'জনে কথা বলছি এমন সময় আকাশে ভয়ানক মেঘ করে এল। তার কিছু বাদেই একটা ঝাপ্‌টা বাতাসে রাস্তার সব ধুলো উড়ে এসে নাকে মুখে পড়ে একেবারে চোখ কাণা করে দেয় আর কি ? রণু তাড়াতাড়ি উঠে রাস্তার দিকের জানালাগুলি সব বন্ধ করে দেয় তবে রক্ষা। তারপরই একেবারে ঝমাঝম্ বৃষ্টি ! সে যে কী বৃষ্টি মা, সে আর কি বলবো—একেবারে যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো !"

কথা বলিতে গিয়া ছেলের খাওয়ার বাধা হইতেছে দেখিয়া মা বলিলেন—"আচ্ছা এখন থাক্, তোর খাওয়া শেষ হলে তখন সব

শুনবো। আগে খেয়ে নে বাছা।" এ কথায় প্রাণতোষ হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, খেয়েই তবে সব বল্‌ছি।"

খাওয়ার পর পান চিবাইতে চিবাইতে মায়ের কাছে বসিয়া প্রাণতোষ বলিতে লাগিলেন—"সেই দিন আমার বাড়ী ফিরতে কত রাত হয়ে গিয়েছিল আর তুমি ঘর আর বারান্দময় কেমন ছট্‌ফট্‌ করে পায়চারী করে বেড়াচ্ছিলে মা, তোমার মনে নেই? ঠিক সেই দিন। মাতা মৃদু হাসিয়া কেবল মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—হাঁ ঠিক বটে!

প্রাণতোষ—"বৃষ্টি যখন থেমে গেল তখন জানালা খুলে দেখি রাস্তা একেবারে জলে থৈ থৈ করছে। কোনও কোনও যায়গায় হাঁটু জলের উপর। ঘোড়ার গাড়ীর চাকাগুলির অর্দ্ধেকের উপর জলে ডুবে যাচ্ছে আর ঘোড়াগুলির পায়ের ধাক্কায় জল ছিট্‌কে একেবারে তাদেরই নাকে মুখে তীরের মত গিয়ে পড়ছে। চারদিকেই কেবল জলের ছপ্‌ ছপ ঝপা-ঝপ্‌ শব্দ। পাড়ার ছেলে গুলোও সব খালি পায়ে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে আর ছুটাছুটি করে জল ছিটোচ্ছে। আমি আর রণু তখন জানালায় দাঁড়িয়ে সব দেখছি। খানিক পরই দেখি একদল মেয়ে আসছে। তাদের দেখে আমি বল্লুম—'রণু ঐ ছাখ ছেলে গুলোর দেখাদেখি এক দঙ্গল মেয়েও কেমন জলে জলে বেড়াতে বেরিয়েছে। আমরাই কেবল এখানে দাঁড়িয়ে রইলুম।' রণু বল্লে—'ওরা ত আর জলে বেড়াতে আসে নি, ওদের স্কুলের যে এই ছুটী হল, তাই এখন সব বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। দ্যাখনা ওদের দশা! ওরা ত আর হাঁটুর উপর কাপড় তুলতে পারে না তাই সমস্ত কাপড় খানাই জলে চুবিয়ে চলেছে।' আমি তখন চেয়ে দেখি দলের আগে আগে একটী মেয়ে, সেই তাদের মধ্যে সব চাইতে বড়, কোমরে আঁচলখানা জড়িয়ে কেমন হাসতে হাসতে জলের উপর চবাং চবাং করে যাচ্ছে।

আর মেয়ে গুলো যেন ভয়ে ভয়ে চলেছে, ওর কিন্তু সে ভাব নেই। আমি তখন রণুকে দেখিয়ে বল্লুম 'ঐ দ্যাখ্, সামনের মেয়েটা কেমন নির্ভীক ভাবে চলেছে, ওর ফুর্ত্তী দেখে আমারও কেমন হিংসা হচ্ছে।' রণু বল্লে—'তা ও আর ফুর্ত্তী করবে না; ওই তো দলের পাণ্ডা! ওকি কাউকে গ্রাহ্য করে?' তারপর তাদের সব কাহিনী বল্লে।"

ছেলের কথার ভাবভঙ্গীতেই মাতা বুঝিলেন ও মেয়ে তা হলে ছেলের অপছন্দ হবে না। তিনি তখন মনে মনে হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁরে পানু, ওই মেয়েটীকে কি তোর খুব পছন্দ হয়েছে?"

মায়ের কথা শুনিয়া প্রাণতোষের যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। তিনি তখন অপ্রস্তুত ভাবে বলিলেন—"মার যে কি কথা! পছন্দ অপছন্দ আবার কি? এক জনদের কথা বল্লেই বুঝি ওসব বলতে হবে। তুমি জিজ্ঞেস কল্লে তাই ত বল্লুম।"

মা হাসিয়া বলিলেন—"নারে বাছা, আমি কি আর বলছি তুই ও মেয়েকে চাস? আমি ভাবলুম, তোর যদি মনে ধরে থাকে তবে না হয় ঐ মেয়েকেই বউ করে ঘরে আনি।"

প্রাণতোষ তখন একটু ক্রোধের ভান করিয়া বলিলেন—"যাও মা, তোমার যা কথা! ও মেয়ে কি আজও আইবড় হয়ে বসে আছে, না আমিই তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি।"

মা—"তুই করতে যাবি কেন, আমিই ত তাকে বরণ করে আনব। তা যদি সে মেয়ে এখনও আইবড় থাকে তবে তাকে তোর বিয়ে করতে কোনও আপত্তি নেই তো? এই হলেই হল।"

প্রাণতোষকে আর উত্তর দেওয়ার অবসর না দিয়াই তিনি কথাগুলি বলিয়া গেলেন। তারপর "অনেক বেলা হয়ে গেল" বলিয়া ক্ষীরোদবাসিনী দেবী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন।

পরদিন বিকালে যখন রণেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল তখন ক্ষীরোদ-বাসিনী দেবী তাহাকে বাড়ীর ভিতরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পরে তাহাকে জল খাইতে দিয়া তাহার কাছে বসিয়া একে একে চট্টোপাধ্যায় বাড়ীর সকল খবর লইতে লাগিলেন। তাঁহার যাহা জানিবার ছিল, তাহা সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া রণেন্দ্রের নিকট হইতে জানিয়া লইলেন। ঘটকী যে সকল কথা বলিয়াছিল এবং মেয়ের যেমন রূপগুণের বর্ণনা করিয়াছিল তাহা সকলই সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তাহার পর যখন রণেন্দ্রের কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন তখন সেও এই প্রস্তাবে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিল। ক্ষীরোদবাসিনীর মনে আশঙ্কা ছিল যে কোনও গোপন কুৎসা রটিয়া যাওয়াতেই বোধ হয় মেয়েটীর বিবাহ হইতে ছিলনা। এক্ষণে বুঝিলেন যে মেয়েটীর স্বাধীন প্রকৃতি এবং বাড়ন্ত দেহই মনের ভ্রম জন্মাইয়া লোকচক্ষে নিন্দার কারণ ঘটাইয়াছে।

ইহার কয়েকদিন পরই রণবীর শর্ম্মা আসিয়া ভগিনীকে সংবাদ দিলেন যে কন্যা দেখিয়া তাঁহার পছন্দ হইয়াছে এবং ভাবী কুটুম্বের সকল অবস্থা যথাযথ জানিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন এবং তিনিও শুভ কার্য্যে সম্মতি জানাইয়া বিবাহের দিন স্থির করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহার পর 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ'র বিস্তারিত কাহিনী বিবৃত করিয়া অনর্থক পাঠকবর্গের রসনায় জলসঞ্চার করিতে বিরত হইলাম। তবে কন্যার বারানসী শাড়ীখানা কোন্ রংএর, তার আঁচলাখানাই বা কিরূপ জমকালো, পাড়ের বাহারই বা কেমন ছিল, কন্যার গায়ে তাহা কেমন মানাইয়াছিল ইত্যাদি, ইত্যাদি অত্যাবশ্যক সংবাদ এবং সর্ব্বোপরি কি কি অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া কন্যাকে বিবাহ-বাসরে উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ না দিলে

পাঠিকাগণ হয়ত কিছুতেই নিষ্কৃতি দিবেন না। তাঁহাদিগের কাছে করজোড়ে এই নিবেদন করিতেছি যে যদিও আমরা বিবাহে অনিমন্ত্রিত হইয়াও উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু গভীর রাত্রিতে বিবাহের লগ্ন ছিল তাই শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কন্যার সাজসজ্জা দেখিবার ধৈর্য্য আমাদের ছিল না। বিশেষ অগ্রেই দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সমাধা করিবার জন্য তাগিদ হইতে দেখিয়া উপস্থিত পরিত্যাগ করা পণ্ডিতদিগের মতে নিতান্ত অবিবেচকের কার্য্য বিধায় সত্বরে তাহা সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং আহার্য্য অপরের হইলেও উদরটী নিজের সে কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া আকণ্ঠ আহার করায় গুরু ভোজনভারে দেহ এমনি ভারাক্রান্ত হইল যে মনে কন্যা দেখিবার ঔৎসুক্যের আর বিন্দুমাত্র স্থান রহিল না। বরং ত্বরায় গৃহিণীর অঞ্চলাশ্রয় গ্রহণ করিলে নিজেরও স্বস্তি হইবে এবং তাঁহাকেও সুখী করা যাইবে ভাবিয়া বিবাহ-বাসর হইতে অবিলম্বেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিলাম। কিন্তু হায়, 'অভাগার সুখ বৈকুণ্ঠেও নাই'—কারণ গৃহিণীও যখন কন্যার বস্ত্রালঙ্কার-বর্ণনা-বিমুখ অপদার্থ স্বামীর মুখসন্দর্শন অন্যায় বোধে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করতঃ নিশি যাপন করিলেন তখন এ মহাপরাধের প্রতিফল হাতে হাতেই পাইলাম। ইহার উপর আবার যদি পাঠিকাগণও এজন্য রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করেন তবে একেবারেই নাচার!

নয়

শাশুড়ী-বধূ

গৃহের সকল কাজে শৃঙ্খলা এবং পারিপাট্য ক্ষীরোদবাসিনী দেবীর একেবারে প্রকৃতিগত ছিল। তিনি কোন বিষয়েই অনিয়ম অমনোযোগ বা বিশৃঙ্খলা দেখিতে পারিতেন না। প্রত্যেক কাজ অতি নিপুণতার সহিত পরিপাটি পরিচ্ছন্ন করিয়া করা তাঁহার অভ্যাস। বেগার ঠেলা কাজ তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। তাঁহার রন্ধন গৃহ এবং শয়নাগার দেখিলেই একথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তৈজসপত্র, গৃহসজ্জা এবং রন্ধনের সামগ্রী যাহা কিছু সমস্তই ইহার প্রমাণ। রান্না ঘরে প্রবেশ করিলেই দেখা যায় ঘরটা তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে। কোনও স্থানে ঝুল বা আবর্জ্জনা নাই। তাকে সারি সারি কৃষ্ণনগরের কালো মাটীর বৈয়ম সজ্জিত। মাসকাবারের জিনিষপত্র আসিবামাত্র মসলাগুলি জলে ধুইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রাখা হয়। চাল-ডাল ভাল করিয়া না বাছিয়া কখনও রান্না করিতে দেন না। আহারের সময় গ্রাসে ভাত ও ডালের কাঁকর পড়িলে কিরূপ অস্বস্তি বোধ হয় তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু অসুবিধা ভোগ করিলেও অনেক বাড়ীতে অবহেলা ও আলস্যবশতঃ এসকল বিষয়ে মোটেই দৃষ্টি নাই। পানের মসলায় কাঁকর-বালি থাকায় কত সময় পান চিবাইতে গিয়া ফেলিয়া দিতে হয় তবুও পূর্ব্বে উহা ধুইয়া বা পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয় না। পান সাজিতে গিয়া খাটে ও দেয়ালের গায়ে চূণের দাগে চিত্রিত করিতে কত বাড়ীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক

বাড়ীতে দেখা যায়, ভাঁড়ারের সিন্দুকে ময়দায়-চিনিতে, লবণে-তেলে, চালে-ডালে মিশিয়া একাকার! একটা জিনিস আনিতে গিয়া অসাবধানতায় অপরটার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এ সমস্ত বিষয়ে ক্ষীরোদবাসিনী দেবীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কত বাড়ীতে অবহেলা-ভরে জিনিষপত্রের এত অপচয় হয় যে বলিবার নয়; এ সকল তিনি দেখিতে পারিতেন না। জায়গার জিনিষ জায়গায় থাকিলে সকলের এবং সব সময় সুবিধা হয়। কিন্তু অনেক স্থানেই তাহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফলে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা সকলেই জানেন। ইহাতে কত সময় নষ্ট হয়, বিলম্বে ঘোরতর অনিষ্টও ঘটে। অব্যবস্থার ফলে একটা জিনিষ আনিতে গিয়া হয়ত আর তিনটা জিনিষ পড়িয়া গেল, কখনও বা নষ্টই হইয়া গেল। ত্বরার সময় একটা জিনিষের জন্য সমস্ত বাড়ী খুঁজিয়া মরিতে হয়। বিশৃঙ্খলায় এইরূপ আরো কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

ধোপার বাড়ী হইতে কাপড় আসিলে প্রায় প্রতিবারেই দেখা যায় জামার বোতাম হয় দু-একটা ভাঙ্গিয়াছে না হয় ছিঁড়িয়া পড়িয়াছে। বাড়ীতেও অনেক সময় ছেলেপিলের জামা হইতে বোতাম খসিয়া যায়। এজন্য ক্ষীরোদবাসিনী একটা কৌটায় করিয়া সব রকম বোতাম কুড়াইয়া রাখিতেন। যখন যেরূপ বোতামের প্রয়োজন হইত কৌটাটি খুলিলেই তাহা পাওয়া যাইত। এইরূপ প্রত্যেক খুঁটিনাটির প্রতি তাঁহার বিশেষ নজর ছিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সারদা ঝিও তাঁহাকে অনেকটা সাহায্য করিত, কারণ সে নিজেও ফিট্‌ফাট্ থাকিতে ভাল বাসিত। বধূ গৃহে আসিবার পর অনেক বিষয়ে বিশৃঙ্খলার ভাব দেখা যাইতে লাগিল। প্রথমটা ছেলে

মানুষ বলিয়া উপেক্ষা করিতেন কিন্তু অবশেষে ভাবিলেন এখন হইতে শিক্ষা না দিলে শেষে আর শোধরাইতে পারা যাইবে না। ভালবাসার টানে যেমন শিক্ষা হয়, শাসনে কখনই তেমন হয় না, একথা তিনি বিশেষ করিয়াই জানিতেন।

পিত্রালয়ে থাকিতে সুষমাকে কখনও এক গ্লাশ জলও গড়াইয়া লইতে হয় নাই। তাহার যাহা কিছু আবশ্যক হইত তাহা সকলে মুখে মুখে যোগাইত, তাহাকে কাহারো জন্য কখনও কিছু করিতে হইত না। কিন্তু প্রতিবেশীর বাড়ীতে তাহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা যাইত। সে যখন কোমরে বসনাঞ্চল জড়াইয়া বঁটি হস্তে তরকারী কুটিতে বসিত তখন প্রাচীনারা তাহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতেন না। সে যেমন ক্ষিপ্রহস্তে কাজ করিত, তেমনি আবার তাহার কাজও নিখুঁত ছিল। দুঃস্থ প্রতিবেশীর বাড়ীতে তাহাকে একাই পঞ্চাশ জনের রন্ধন এবং পরিবেশন কার্য্য সমাধা করিতে দেখা গিয়াছে। সে যখন আজানুবিলম্বিত চুলের রাশি ঝুঁটির আকারে মস্তকের উপরে স্থাপন করিয়া কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগিত তখন তাহাকে আর বালিকা বলিয়া মনে হইত না। এইরূপে কখনও বা রন্ধনকার্য্যে কখনও বা পরিবেশনকার্য্যে তখন তাহার সেই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইত। আবার কোনও বাড়ীতে ভাঁড়ারী হইয়া বসিলে একটী জিনিষ চুরি বা অপচয় হয় কি সাধ্য?

কিন্তু নিজের বাড়ীতে সুষমা ঠিক ইহার বিপরীত। পিসীমার অত্যধিক আদরই অবশ্য ইহার কারণ। এজন্য তাহার খামখেয়ালীরও অন্ত ছিল না। শ্বশুরালয়ে আসিয়াও তাহার সে ভাব দূর হইল না। তাহাকে কোনও কাজের কথা বলিলে তাহার কিছুতেই তাহা মনে থাকিত না। সারদা এজন্য তাহাকে কথা শুনাইতে ছাড়িত না, কিন্তু

শাশুড়ী ছেলে মানুষ বলিয়া সে সকল ত্রুটী নিতান্তই অগ্রাহ্য করিতেন এবং শাসনের পরিবর্ত্তে আদর করিয়া পুনরায় যাহাতে এমন না ঘটে সে বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

সেদিন দশহরার গঙ্গাস্নান। ভোরবেলায় সদী গোয়ালিনী বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়াই মাঠাকরুণকে ডাকিবা মাত্র আগেই সারদা নীচে নামিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া সদী বলিল—"সারদিদি, আজ দশরার দিন। তুমিও চল গঙ্গাস্নানটা করে আসবে।"

সারদা—"আমি ও তাই ভাবছিলুম। তা খুকুমণি আগে থাকতেই মাকে বলে রেখেছে দশরার দিন সেও গঙ্গানাইতে যাবে। আবার আমিও যদি চলে যাই তাহলে একলা বউমা কি করেই বা সব সাম্‌লাবে? তাছাড়া আজ আবার ফিরতেও ত একটু দেরী হবে।"

সদী—"তা হ'লেই বা। আমাদের কতই বা আর দেরী হবে? ৮টাই বাজুক? দাঁড়াও আমি মা ঠাকরুণকে বলছি।"

এমন সময় ক্ষীরোদবাসিনী দেবী নীরুকে সঙ্গে করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। তাহাদের শেষ কথাটুকু মাত্র তাঁহার কানে যাইতেই তিনি সদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"'মা ঠাকরুণকে কি বলবার কথা হচ্ছিল?"

সদী—"এই বলছিনু কি মা, সারদিদি তুমি ও আজ আমাদের সঙ্গে গঙ্গানাইতে চল। তা সে বল্লে বউমাকে একলা রেখে কি করে যাবে? হ্যাঁগা, মাঠাকরুণ, আজ একটা পূণ্যির দিন! ও গেলে কি তেমন কাজ আটকাবে?"

ক্ষীরোদবাসিনী—"না না, এমন কি কাজ? তা চলুক না সারদাও আমাদের সঙ্গে। আমি তা হলে একটীবার বউমাকে সব বুঝিয়ে বলে

আসছি।" এই বলিয়াই তিনি উপরে চলিয়া গেলেন। তারপর বউমাকে সেদিনকার রান্নার কি হবে না হবে সব বলিয়া তাঁহারা গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন।

সুষমা নীচে নামিবার পূর্ব্বেই ভগীরথ উনুন ধরাইয়া দুধেরকড়া চাপাইয়া দিল। তারপর বাবু হেদোয়া হইতে ফিরিবা মাত্র বউমাকে ডাকিয়া আনিল। সুষমা নীচে আসিয়াই স্বামীকে দুধ খাইতে দিয়া ভাঁড়ার হইতে চাল ডাল বাহির করিয়া দিল এবং ভগীরথকে সব ধুইয়া দিতে বলিয়া নিজে তরকারী কুটিতে বসিয়া গেল। ভগীরথ চাল ডাল ধুইয়া ফিরতে না ফিরতেই তাহার সুক্ত, ডালনা ও মাছের ঝোলের তরকারী কুটা হইয়া গেল। তারপর ডালের হাঁড়ি চাপাইয়াই ভগীরথকে মসলা বাটিতে দিয়া সে বাজারের পয়সা আনিতে উপরে চলিয়া গেল। পয়সা লইয়া ফিরিবার সময় দেখিল একদল ছেলে গঙ্গার বন্দনা গাহিতে গাহিতে রাস্তা দিয়া চলিয়াছে আর ওপারের ফুটপাথের উপর বসিয়া একজন অন্ধ খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাহিতেছে। ইহা দেখিয়াই সুষমা সেখানে দাঁড়াইয়া গেল।

এদিকে বাটনা বাঁটা শেষ করিয়া ভগীরথ মাছের চুপড়ির খোঁজ করিতে যাইবে এমন সময় ডাল পোড়ার গন্ধ পাইল। কাছে থাকিলে পোড়া গন্ধ অপেক্ষাকৃত একটু বিলম্বেই নাকে প্রবেশ করিয়া থাকে। ভগীরথ গন্ধ টের পাইবামাত্র বউমাকে ডাকিয়া আনিল। সুষমা আসিয়াই তাড়াতাড়ি ডালের হাঁড়ি উনুন হইতে নামাইল বটে, কিন্তু তখন হাঁড়ীর তলায় অনেক খানি ডাল লাগিয়া গিয়াছে। যাহা হইবার হইয়াছে, আর এখন উপায় নাই। তখন উপর হইতে ডাল তুলিয়া রাখিয়া হেঁসেল হইতে হাঁড়ী বাহির করিয়া দিল। ইহার পর সুক্ত ও ডালনা রাঁধা হইয়া গেলেই ভগীরথকে বাজারে পাঠাইয়া সুষমা ভাতের

হাঁড়ী চাপাইয়া দিল এবং পুনরায় উপরে গিয়া সেই অন্ধের গান শুনিতে লাগিল। তারপর অন্ধের অতি করুণ স্বরের গান শুনিয়া তাহার কষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে এমনই তন্ময় হইয়া গেল যে কখন উপরে আসিয়া প্রাণতোষ পোষাক পরিলেন এবং তাহার সম্মুখ দিয়াই রোগী দেখিতে বাহির হইয়া গেলেন তাহা সে যেন দেখিতেও পাইলনা। ভাতের হাঁড়ী যে কতক্ষন চড়াইয়া আসিয়াছে সে কথাও একটী বার মনে আসিল না।

গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া বাড়ীতে ঢুকিবা মাত্র ভাত পোড়ার বিষম গন্ধ পাইয়াই সারদা চেঁচাইয়া উঠিল। সেই চিৎকারে তখন সুষমার চমক ভাঙ্গিল। কিজন্য যে সারদা চেঁচামেচি করিতেছে তাহা তখন ও সে বুঝিতে পারে নাই। তারপর যখন নীচে আসিল তখন দেখে যে ক্ষীরোদবাসিনী ভাতের হাঁড়ীটা উনুন হইতে নামাইয়া গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে আর শাশুড়ী আঙ্গিনার কোনে পা ধুইয়া রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াইয়া বলিতেছেন—"আরে, থাম তোরা, এত চেঁচাসনে। হয়েছে কি একবার দেখি?"

সারদা—"আর দেখতে হবে না। বউ যে একাণ্ড করবে সেত জানা কথা। বা-বা, বা-বা, এমন মেয়েও কখন দেখিনি। ভাতগুলি পুড়িয়ে একেবারে ছাই করেছে, তবু তার হুঁস্ নেই!

ক্ষীরোদবাসিনী—"তোমাদের এখানে কাউকে চেঁচাতে হবে না। সব এখান থেকে যাও, যা দেখবার আমি দেখছি।"

"বা-বা, বা-বা, শত অন্যায় করলেও বউকে কারো একটী কথা বল্‌বার জো নেই। এই করেই আরও তার মাথাটি খাবেন।" এই বলিয়াই সারদা মুখ ভার করিয়া উপরে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে বলিল—"অদৃষ্টে আজ বিধাতা পুরুষ ভাত মাপেননি দেখছি।"

সুষমা নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া বিষণ্ণভাবে মাটির দিকে চাহিয়া বলিল—"মা, আমায় মাপ করুন, আমি উপর থেকে একটুও গন্ধ টের পাইনি।"

শাশুড়ী হাসিয়া বলিলেন—'মা, অমন হয়েই থাকে তার জন্য তুমি মন খারাপ করোনা। উপরে বুঝি কাজ কর্‌ছিলে তাই আসতে দেরী হয়েগেছে?' এই বলিয়া বধূর দিকে প্রশ্ন করিলেন। সুষমা লজ্জিতভাবে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—"মা, ডালটাও একটু ধরে গেছে।' শাশুড়ী তখন বলিলেন—"তা, হোক গে, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।" তারপর নিজের মনে বলিতে লাগিলেন—"ছেলে মানুষকে একলা ফেলে যাওয়াটাই ভাল হয়নি।" পরে বধূকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"যাক মা, যা হবার হয়েছে।" ও হাঁড়ীর ভাতটা ফেলে আর এক হাঁড়ী চাপিয়ে দিলেই হবে। তুমি এখন উপরে যাও।" তিরস্কারের পরিবর্ত্তে শাশুড়ীর এই করুণামাখা কথায় সুষমার তখন টস্ টস্ করিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িল। সেদিন তাহার যে শিক্ষা হইল জীবনে তাহা সে আর কখনও ভুলে নাই।

সারদা প্রাণতোষেরও তিন বৎসরের বড়। কাজেই সে বউমার উপর একটু আধিপত্য করিতে ছাড়িত না। সারদা এবং সুষমা উভয়েরই বাল্যশিক্ষা প্রায় একরূপ—দুইই অতিশয় আদরে পালিতা। কাজেই নীরোদবাসিনীকে সে নিজে মানুষ করিয়াছে বলিয়া তাহার উপর যতটা কর্ত্তৃত্ব সারদা এতদিন চালাইয়া আসিতেছে বউমার উপরও সেই কর্ত্তৃত্ব জাহির করিতে গিয়া যখন তাড়া খাইতে বাধ্য হয় তখন অপ্রস্তুত হইয়া মনে মনে বিষাইয়া উঠে। সুষমা বাড়ীতে কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না বরং তাহাকেই সকলে ভয়ে ভয়ে চলিত, এখানে একটা ঝি কিনা যখন তখন তাহাকে কথা শুনাইতে আসে ইহা তাহার

একেবারেই অসহ্য! এইরূপে ক্রমে উভয়ের মধ্যে একটা মনান্তরের সৃষ্টি হইল।

সুষমা তেজীয়ান কিন্তু অতিশয় সরল। তাহার সাদামনে কখনও কুটিলতার লেশ ছিল না। সে সারদাকে মুখের উপর কখন কখন এমন স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিত এবং তাহা অনেক সময় একটু তীব্র হইয়া পড়িত যাহা এবাড়ীর পক্ষে নিতান্তই অনভ্যস্ত। কারণ ক্ষীরোদ বাসিনীকেও অনেক সময় সারদাসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কিন্তু-ভাবে চলিতে দেখা যাইত—উহার বাল্যকালে কত অত্যাচারই না তিনি নীরবে সহিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সুষমা এরূপ কিছু বলিবার পরক্ষণেই হয়ত সে কথা ভুলিয়া যাইত, মনে কিছু 'গিরো' দিয়া রাখিবার অভ্যাস তাহার একেবারেই ছিলনা। প্রয়োজন হইলে সে হয়ত আবার হাসি মুখে কথা বলিতে আসিত কিন্তু সারদার বিক্ষুব্ধ মুখমণ্ডল তখন শ্রাবণের আকাশের ন্যায় ঘন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, কখনও বা তাহার অভিমান-সন্তপ্ত নয়ন যুগল হইতে বারিবর্ষণ হইতে দেখা যাইত।

তিন দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর আজ আকাশ মেঘমুক্ত হইয়াছে। প্রভাতের তরুণ অরুণ যখন পূর্ব্বগগনপ্রান্তে কিরণ-জাল বিস্তার করিতে সমুদ্যত তখন স্থানে স্থানে পুঞ্জীকৃত পেঁজা তুলারাশির ন্যায় মেঘপুঞ্জ বায়ুভরে নীলাকাশের গায়ে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। ক্রমে যখন হেলিতেদুলিতে তপনদেব উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া সুবৃহৎ অগ্নিগোলকবৎ আরক্ত নয়ন উন্মিলন করিলেন, তখন সেই দীপ্ত-কটাক্ষে ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া জীমূতরাজি পলায়ণপর হইল। বেলা দ্বিপ্রহর হইতে না হইতেই সমস্ত আকাশ অনন্ত নিলীমায় ছাইয়া ফেলিল। নীল নভোচন্দ্রাতপ-তলে বারিস্নাত নবপত্র-শোভিত বৃক্ষরাজি রবিকর-সম্পাতে ঝিক্ ঝিক্

করিতেছিল। এদৃশ্য দেখিলে কাহার না নয়নমন এক অপূর্ব্ব পুলক ভরে অভিভূত হয়?

আহারের পর সুষমা বারান্দায় বসিয়া একদৃষ্টে আকাশের পানে তাকাইয়া তন্ময় চিত্তে সেই শোভা দেখিতেছিল। কতক্ষণ যে এভাবে কাটিয়াছিল তাহার সে হুস্ ছিল না। শাশুড়ীর ডাকও তখন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। হঠাৎ পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। তারপর পিছন ফিরিয়া চাহিতেই সারদা বলিল—"যা হোক্ বউ একি তোমার আক্কেল? আমি তোমায় সারাবাড়ী খুঁজে মরছি, আর তুমি এখানে চুপটি করে বসে আছ? কাল একাদশী গেছে আর আজ এত বেলাতেও শাশুড়ীর খাওয়া হল কিনা একবারটী খোঁজ নিতে নেই?" এই অনুযোগে অপ্রতিভ হইয়া সুষমা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া শাশুড়ীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

ক্ষীরোদবাসিনীর স্বভাবতঃ স্নেহ-কোমল প্রাণ সুষমাকে নিজ সন্তানের মতই আপন ক্রোড়ে আকর্ষণ করিত। বিশেষতঃ মাতৃহীন বলিয়া বরং বধূর প্রতি মমতার পীযুষধারা কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায়ই ক্ষরিত হইত। আজকাল আহারের সময় কন্যা এবং বধূ উভয়ে উপস্থিত না থাকিলে ভাল করিয়া তাঁহার খাওয়াই হইত না। তাহারাও প্রতি-দিন সে সময়ে তাঁহার কাছে বসিয়া গল্প করিত এবং তাঁহার আহারের তত্ত্বাবধান করিত। আজ বধূকে অনুপস্থিত দেখিয়া কয়েকবার বউ-মাকে ডাকিয়াও যখন কোনও সাড়া পাইলেন না তখন ভাত বাড়িয়া খাইতে বসিয়াও তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বউমা তখনও আসিল না দেখিয়া সারদা তাহাকে খুঁজিতে বারান্দার কাছে গিয়া তাহাকে আনমনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াই কতগুলি কথা শুনাইয়া মনের ঝাল মিটাইল। কিন্তু অন্য দিনের ন্যায় তাহার সে ঝাঁঝাল

কথার কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়াই সুষমা চলিয়া গেল দেখিয়া সারদা যেন কতকটা অপ্রতিভ হইল।

সুষমা ছুটিতে ছুটিতে শাশুড়ীর কাছে আসিয়াই কাতর ভাবে বলিল —"মা, আপনার দুটি পায়ে পড়ি, কিছু মনে করবেন না। আপনার এখন খেতে বসবার কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। আমার কি বিশ্রী মন, একটা ভাবতে গেলে আর একটার কথা মনেই থাকে না।"

শাশুড়ী বাধা দিয়া বলিলেন—"ওকি, মাপ করবার কি হয়েছে? এইত সবে আমি বসেছি। আমার খাবার সময় কাছে না থাকলে তোমার কষ্ট হবে জেনেইত ডেকে পাঠিয়েছি। ওঃ, সারদা বুঝি গিয়ে তোমায় আবার বকেছে?"

সুষমা—"না, মা, বকবে আর কি? আমারইত অন্যায় হয়েছে। কাল উপোস গেল আর আজ এতটা বেলা হয়ে গেছে তবু খোঁজ নিইনি।"

শাশুড়ী—"বুঝেছি, সারদার যেমন কাজ। এত জানলে ওকে না পাঠিয়ে নীরুকেই ডাকতে পাঠাতুম। না মা, আমার একটুও দেরী হয়নি। তুমি বোস মা, নীরু কেঠোটা থেকে একটু নুন দেত মা।"

নীরোদবাসিনী উঠিতে না উঠিতেই সুষমা নুন আনিয়া দিল। শাশুড়ী বলিলেন—"মা, তোমরা কাছে বসলে কথায় কথায় খাওয়াটা হয়ে যায়, তা নইলে একলাটি মুখ বুজে খেতে পারি না।"

এইরূপে স্নেহের শাসনে ক্ষীরোদবাসিনী বধূকে মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

দশ

পুনর্ব্বিবাহ

যেদিন রণবীর শর্ম্মা নীরুকে পুনরায় বিবাহ দিবার স্থির সংকল্পের কথা ভগ্নীকে বলিয়া গেলেন তাহার পর দিনই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে প্রতুলচন্দ্র তাঁহাকে একটি উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান লইতে অনুরোধ করেন। তখনই তাঁহার মনে হইল এই ঠিক নীরোদবাসিনীর উপযুক্ত পাত্র জুটিয়াছে। প্রতুলচন্দ্রকে প্রকাশ্যে সে কথা কিছু না বলিয়া সেদিন কেবল এই মাত্র বলিলেন যে অতি উপযুক্ত পাত্রীই তাঁহার হাতে আছে, তিনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আর একথাও বলিলেন যে যত সত্বর হয় তিনি তাঁহাকে পাত্রী দেখাইবেন এবং বিবাহের ব্যবস্থাও করিয়া দিবেন।

ইহার পর দিনই রণবীর শর্ম্মা দেশ হইতে তাঁহার বৃদ্ধা মাতার গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া সেই রাত্রিতেই দেশে চলিয়া গেলেন। দেশে যাইবার তিন দিবস পরেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইল এবং শ্রাদ্ধাদি শেষ করিয়া কলিকাতায় ফিরিতে তাঁহার অনেকটা বিলম্ব হইল। অবশেষে যে দিন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন সেই দিন সন্ধ্যার সময় ভগ্নীর বাড়ীতে আসিয়াই শুনিলেন যে ক্ষীরোদবাসিনী দেবী নীরুকে লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কাজেই তখন আর প্রতুলচন্দ্রকে পাত্রী দেখাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না।

ক্ষীরোদবাসিনী দেবী তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর রণবীর শর্ম্মা যেদিন ক্লাইভ ষ্ট্রীটের জাহাজ আফিস হইতে বরাবর টেলিগ্রাফ

আফিসে গেলেন সেইদিনই প্রাতে প্রতুলচন্দ্র তাঁহার মাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তখন তিনিও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হায়দ্রাবাদে টেলিগ্রাম করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন। প্রতুল চন্দ্রের নগ্নপদ ও উস্কখুস্ক চেহারা দেখিয়া রণধীর তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"ব্যাপার খানা কি?" প্রতুলচন্দ্র তখন তাঁহার জননীর মৃত্যু সংবাদ জানাইলেন এবং সেইদিন রাত্রিতেই তিনি দেশে চলিয়া যাইতেছেন এ কথাও বলিলেন। তখন তাড়াতাড়িতে আর অধিক কথা বলিবার সুযোগ ঘটিল না। তাহার পর প্রতুলচন্দ্রের কলিকাতায় ফিরিতে তিনমাসেরও অধিক বিলম্ব হইল এবং এদিকে প্রাণতোষের বিবাহ ইত্যাদিতেও কিছুদিন গোল মালে কাটিয়া গেল। কাজেই নীরোদবাসিনীর বিবাহের কথা কিছুদিনের জন্য চাপা পড়িয়া গেল।

প্রতুলচন্দ্র দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ডেপুটিগিরি পাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিলেন। নিজে দাঁড়াইবার মত সংস্থান না করিয়া কিছুতেই বিবাহ করা সঙ্গত হইবে না তিনি তখন এই যুক্তি-পথ অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন! এইরূপ বিবাহের ফলে কিরূপ সামাজিক নির্য্যাতন আরম্ভ হয় ইতিমধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহার উপর আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যদি আবার আর্থিক অনটনে হাবুডুবু খাইতে হয় তবে তো আর কথাই নাই। কাজেই প্রতুলচন্দ্রের যুক্তি তাঁহার কাছে সঙ্গত বলিয়াই মনে হইল। কোমল-প্রাণ বিদ্যাসাগর কাহারো দুঃখ দেখিয়া কখনও স্থির থাকিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ বিধবা-বিবাহে যাহারা আবদ্ধ

হইতেন সেই পরিবারকে তিনি নিজ পরিবারের ন্যায় স্নেহ-বক্ষে টানিয়া লইতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় ছয় মাসের মধ্যেই প্রতুলচন্দ্রের ডেপুটিগিরি লাভের সম্ভাবনা হইল। একথা জানিয়া রনবীর শর্ম্মা আর কিছুতেই কালবিলম্ব করা উচিৎ মনে করিলেন না। তিনি তখন একদিন বিকালে প্রতুলচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া প্রাণতোষের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। মাতুল যে অভিপ্রায়ে প্রতুলচন্দ্রকে তাঁহাদের বাটীতে আনিয়াছেন প্রাণতোষের তাহা জানিতে বাকী ছিল না। কিন্তু ক্ষীরোদ-বাসিনী দেবীকে কিম্বা তাহার কন্যাকে এবিষয়ে ঘুণাক্ষরেও জানিতে দেওয়া হয় নাই। বাহিরের ঘরে বসিয়া তাঁহারা নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে কেবল উচ্চ হাস্যের ধ্বনি উত্থিত হইয়া বাড়ীর ভিতরেও শব্দায়মান হইতেছিল। সে হাস্য-লহরীর তানে কৌতুহলী সারদার মন আকৃষ্ট হইল এবং সে ধীরপদে উপর হইতে নামিয়া আসিয়া বাহিরের ঘরের জানালার আড়ালে আড়ি পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

নীরোদবাসিনী বিকাল বেলায় গা ধুইয়া ভিজা চুলগুলি পিঠের উপর ঝুলাইয়া ভাঁজ করা গামছাখানা মাথার উপর রাখিয়াই দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় সারদাকে বাহিরের ঘরে জানালার পাশে চুপি চুপি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কৌতূহলী চক্ষে প্রশ্নবোধক ইঙ্গিত করিল। সারদাও উত্তরে চক্ষের ইসারায় তাহাকে একটা অভিনব কিছু দেখিবার জন্য আহ্বান করিল। ঠিক এই সময় প্রাণতোষ অভ্যাগতদিগের জলযোগের ব্যবস্থা করিবার জন্য মাতার কছে যাইতে-ছিলেন। হটাৎ তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া সারদা অপ্রতিভ ভাবে তাড়াতাড়ি পিছন দিকে সরিয়া পাশের বাড়ীর দেয়ালের দিকে এমনি

একান্তে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া রহিল যেন সেখানে কি অপূর্ব্ব জিনিষই দেখিবার রহিয়াছে! নীরোদবাসিনী তখনও এক পা সিঁড়ির উপরের ধাপে এবং এক পা নীচে রাখিয়া সারদার দিকে চাহিয়া ছিল। প্রাণতোষের মন তখন অপর বিষয়ে অভিনিবিষ্ট ছিল, তিনি এসকল কিছুই লক্ষ্য না করিয়া তাড়াতাড়ি নীরোদবাসিনীর কাছে গিয়া চাপা গলায় বলিলেন—"ওঃ, তুই এখানে? যাক্ তাহলে আর আমি মার কাছে যাব না; তুই শিগ্‌গীর গিয়ে মাকে বল যে মামা ও আর একটী ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁদের জন্য ক'খানা গরম গরম লুচি ভেজে দিতে হবে আর বাজার থেকে ভগীরথকে দিয়ে যেন কিছু মিষ্টি আনিয়ে দেওয়া হয়। আমরা বাইরের ঘরে বসে আছি, বেশী দেরী যেন হয় না; বুঝলি?" নীরোদবাসিনী দাদার কথার জবাবে সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়াই দৌড়িয়া উপরে উঠিয়া গেল। পিছনে পিছনে সারদাও তখন তাহার নিত্য-কর্ম্ম পান-সাজার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেল।

দাদার কথায় যখন নীরোদবাসিনী তাঁহার মাতার কাছে ছুটিয়া গেল তখন শাশুড়ী বধূমাতার চুল বাঁধিতে বসিয়াছিলেন। চুলগুলি আঁচড়াইয়া দুইটী বেণী প্রস্তুত করতঃ খোঁপার আকারে জড়াইয়া চুলের ফিতার একধার ঠোঁটে চাপিয়া অপর প্রান্তদ্বারা খোঁপার গোড়াটি বাঁধিতেছিলেন এমন সময় কন্যা আসিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলিল—"মা, দাদা বলে দিলেন শিগ্‌গীর কয়খানা লুচি ভেজে দিতে আর ভগীরথকে দিয়ে কিছু খাবার আনিয়ে দিতে। একটী ভদ্রলোক ও মামা বাইরের ঘরে বসে আছেন, তাঁদের খেতে দিতে হবে।"

এই কথা শুনিয়া ক্ষীরোদবাসিনী দেবী ওষ্ঠের চাপ হইতে ফিতার প্রান্তটী মুক্ত করিয়া বাম হস্তের মুষ্টিতে তাহা সটান ভাবে ধরিয়া

খোপার গোড়ায় আর একটা পেঁচ দিতে দিতে বলিলেন—"যাও মা নীরু, সারদাকে উনুনটা ধরাতে বলে তুমি চটু করে ভাঁড়ার থেকে খানিকটা ঘি আর ময়দা বের করে নিয়ে এস। আমার এই হয়ে গেল, বউমা এখনি গিয়ে ভাজবার মত কয়েকখানা পটোল আর বেগুন কুটে দিয়ে একটা আলু-পটোলের ডাল্‌নার যোগাড় করে নেবে এখন। আমি ততক্ষণে গা-হাত-পাটা ধুয়ে আসি।"

মাতার আদেশ মত নীরোদবাসিনী সারদাকে খুঁজিতে গিয়া দেখে যে সে তখনও সেই জানালার পাশে কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে তখন চুপি চুপি কাছে গিয়া সারদার আঁচল ধরিয়া টানিল। হটাৎ আঁচলে টান পড়িতেই সারদা চমকিয়া উঠিল এবং মুখ ফিরাইবা মাত্র নীরোদবাসিনীকে চোখে পড়াতেই হাসিতে হাসিতে আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। নীরোদবাসিনী হঠাৎ এই আদরের কারণ বুঝিতে না পারিয়া সারদাকে টানিতে টানিতে সিঁড়ির কাছে নিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল—"মা বল্লেন, শিগ্‌গীর উনুনে আগুন দাও।" সারদা—"যাচ্ছি" এই বলিয়া আবার তাহাকে জড়াইয়া একটা চুমা খাইল। আজ যেন সারদার আনন্দ উছলিয়া পড়িতেছিল। সুষমা যখন রান্না ঘরে আসিলেন তখন তিনিও তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। তখন সারদাকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি গো, আজ যে তোমার চোখে-মুখে আর হাসি ধরে না। ব্যাপারখানা কি?" সারদা তখন বউমার কানে কানে বলিল—"আজ যে খুকুমণির বর এসেছে।" নীরোদবাসিনীকে সকলে আদর করিয়া 'নীরু' বলিয়া ডাকিলেও সারদা আজও তাহাকে 'খুকুমণি' বলিয়াই ডাকে। সারদার কথায় সুষমা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"সেকি গো? বল

কি ?” সারদা হাসিয়া বলিল—“সত্য মিথ্যা দেখতেই পাবে।” ঠিক সেই সময়ে পুনরায় প্রাণতোষ বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সারদার সমক্ষে স্বামীকে দেখিয়াই সুষমা তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া উনুনে কড়া চাপাইয়া দিলেন। প্রাণতোষ তখন—“হয়ে গেলেই যেন আমাকে ডেকে দেওয়া হয়” এই বলিয়াই চলিয়া গেলেন।

আধঘণ্টা পরেই ভগীরথ আসিয়া জানাইল যে মাঠাকরুণ একবার বাবুকে উপরে ডাকিতেছেন। প্রাণতোষ তখন মাতুলকে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। উপরে গিয়াই দেখিলেন যে তিনখানা আসন পাতিয়া জলযোগের সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহা দেখিয়া মাতাকে বলিলেন যে তাঁহারা যখন আহার করিতে বসিবেন তখন নীরু যেন তাঁহাদিগকে পরিবেশন করে। সে কথা শুনিয়া মাতা বলিলেন—“না, না, বউমা থাক্‌তে ও কেন করবে ?” কিন্তু প্রাণতোষ সে কথায় কান না দিয়া একটু জোর করিয়াই বলিয়া গেলেন—“না, ওসব হবে না। আজ নীরুকেই পরিবেশন কর্‌তে হবে।” এই বলিয়া সুষমার খোঁজে পুনরায় রান্না ঘরে প্রবেশ করিলেন। সারদা ততক্ষণ পান সাজিতে উপরে গিয়াছে এবং নীরোদবাসিনী মায়ের নির্দ্দেশ মত রেকাবীতে খাবার সাজাইতেছে। তখন সুষমাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন—“এখনই উপরে গিয়ে নীরুকে একখানা নূতন ধোপার-কাপড় পরিয়ে দাও, আর বেশ করে গা-মুখটা মুছিয়ে একটু পরিষ্কার করে দিয়ে ওকে পরিবেশন করতে পাঠিও।” সুষমা উচ্ছ্বসিত হাসি ওষ্ঠে চাপিয়া চোখে মুখে আনন্দ-তরঙ্গের ঢেউ খেলাইয়া স্বামীর চোখে চোখ মিলাইলেন এবং পর মুহূর্ত্তেই “যাচ্ছি” এই বলিয়াই ছুটিয়া উপরে

চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার মনের ভ্রম দূর হইল, সারদার অনুমানই সত্য বলিয়া বুঝিতে আর বাকী রহিল না।

পরণে একখানা কাল ফিতা-পাড় ধূতি, হাতে দুই গাছা চুড়ি এবং গলায় একটী সরু চেন-হার—এই বেশে নীরোদবাসিনী দুই হাতে দুইখানা মিষ্টান্নের রেকাবী হাতে করিয়া পরিবেশন করিতে উপস্থিত হইলেন। মস্তকের ভিজা চুলের রাশি পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত হইয়া বায়ুভরে দুলিতেছিল। নীরোদবাসিনী এক্ষণে ষোড়শী যুবতী। তাঁহার গৌর-বর্ণ সুঠাম সুকোমল দেহ সুরঞ্জিত কারুকার্য্য শোভিত বস্ত্রালঙ্কার-বিবর্জ্জিত হইলেও তাহা লাবণ্যে ঢল ঢল করিতেছিল। ঘন-কৃষ্ণ কেশ-দাম হইতে বিচ্ছিন্ন অলকগুচ্ছ যখন বায়ুভরে তাহার সলজ্জ আরক্তিম কপোলে লুণ্ঠিত হইতেছিল তখন সেই অপূর্ব্ব মাধুরীমণ্ডিত বদনমণ্ডল দেখিয়া প্রতুলচন্দ্র নিতান্তই মুগ্ধ হইলেন। সমাজসংস্কারে ব্রতী হইয়া সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য পরহিত-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে উপস্থিত হইয়াছেন সে আত্মাভিমান তখন আর রহিল না। আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেখাইতে আসিয়া প্রকৃতপক্ষেই এখানে আত্মদান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন মনে করিলেন।

ইহার পর একদিন স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। ক্ষীরোদবাসিনী রণবীর শর্ম্মার উপযুক্ত ভগিনী। তিনি এক দিকে যেমন মিষ্টভাষিনী, উদার-হৃদয়, মমতার প্রস্রবিনী, আর এক দিকে তেমনি স্পষ্টবাদিনী, সৎসাহসিনী এবং তেজীয়ান নারী। পুত্র এবং ভ্রাতার নির্ব্বন্ধাতিশয় ও প্রবল যুক্তির প্রভাবে এবং স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়স্পর্শী, উৎসাহপূর্ণবাক্য ও উপদেশের ফলে যখন তিনি কন্যার পুনর্ব্বিবাহ সঙ্গত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন তখন আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধতা এবং পাড়া-প্রতিবেশীনী-

দিগের নাসিকা-কুঞ্চনের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। এ বিষয়ে সদী গোয়ালিনী প্রতিবেশীনীদিগের সহিত কোমর বাঁধিয়া লড়াই করিতে ছাড়িল না এবং তাহার নাসিকাস্থিত সুদর্শন-চক্রের দ্রুত চালনায় সন্ত্রস্থ হইয়া অনেককেই রণে ভঙ্গ দিতে হইয়াছিল!

বিবাহের দিন নব্যতন্ত্রের সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হইল এবং তদনুসারে আহার্য্যের ব্যবস্থাও করা হইল। কিন্তু কার্য্যকালে বিবাহ-বাসরে অতি অল্প লোকই উপস্থিত হইলেন। এজন্য আহার্য্য দ্রব্যাদি বহু পরিমানে উদ্বৃত্ত হইল এবং এত আয়োজন বৃথা হইল ভাবিয়া ক্ষীরোদবাসিনী একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু পর দিবস পরিতৃপ্তির সহিত কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া সে সকল জিনিসের সদ্ব্যবহার করিলেন এবং নিজেও তৃপ্ত হইলেন। বিবাহের রাত্রিতে সারদা একাই বাসর-ঘর জাকাইয়া বসিল এবং 'খুকুমণির' বিবাহে তাহার আনন্দ-উচ্ছাসের বন্যা বহিতে লাগিল। বর-কনে দেখিবার প্রলোভন এড়াইতে না পারিয়া প্রতিবেশীনীদিগের অনেকে লুকাইয়া বিবাহবাসরে উপস্থিত ছিলেন এবং কেহ কেহ সারদার সহিত বাসর-ঘরের রঙ্গ-তামাসাতে যোগদান করিতেও দ্বিধা বোধ করিলেন না। কেবল আহারের সময়ে সকলেই নিষ্ঠাচারিণী থাকিয়া জাতিধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিলেন।

এগার

বিপত্নীক

ফুলশয্যার পরদিন প্রাতে প্রতুলচন্দ্র ডেপুটিগিরির নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হইলেন। কলিকাতায় তাঁহার নিজের কোন বাড়ী ছিলনা বলিয়া বিবাহের রাত্রি হইতে শ্বশুরালয়ে বাস করিতে ছিলেন। ডেপুটির পদ প্রাপ্ত হইয়াই প্রতুলচন্দ্র পাবনায় গেলেন। তথায় কিছুকাল কার্য্য করিয়া বগুড়ায় বদলী হইলেন। প্রথম চাকরীস্থলে যাইবার সময় নীরোদ-বাসিনীকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া গেলেন। কারণ হাকিম হইলেও তাঁহার মফঃস্বল-শহরে পরিবার লইয়া বাস করা অতিশয় কঠিন হইবে একথা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কেননা সে সকল জায়গায় সামাজিক দলাদলি এবং নির্য্যাতন অত্যন্ত অধিক হইবারই সম্ভবনা। বিশেষতঃ যখন নিজের দলের একটিও লোক সেখানে পাইবার আশা নাই।

মফঃস্বল-শহরে নূতন ডেপুটির আবির্ভাব হইলে তাহা জানিতে কাহারও অধিক সময়ের আবশ্যক হয় না এবং সর্ব্বাগ্রে স্থানীয় উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীদিগের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইতেও বিলম্ব ঘটেনা। কাজেই নবাগত ডেপুটি বাবুর সহিত স্থানীয় জিলাস্কুলের হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের অচিরেই সাদর সম্ভাষণ হইল।

এই সময়ে বগুড়া জিলাস্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন কৃষ্ণনাথ রায়। সম্প্রতি ইহার পত্নী-বিয়োগ ঘটিয়াছিল। মৃত্যুকালে স্ত্রী পদ্মমণি স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ দুই বৎসরের কন্যা গুণমণিকে রাখিয়া যান। হেড্‌

মাষ্টার বাবুর গৃহে আর অপর কোনও স্ত্রীলোক বা আত্মীয় না থাকাতে এই 'গৃহশূন্য' অবস্থায় তিনি শিশুকন্যাটিকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ছোট ছোট শহরে পরস্পরের ঘরের খবর সহজেই জানা-জানি হইয়া থাকে। একদিন কথায় কথায় ডেপুটি প্রতুলচন্দ্র সে কথা জানিতে পারিয়া সে দিবস সন্ধ্যাকালে হেড্‌মাষ্টার বাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন হেড্‌মাষ্টার বাবুর সহানুভূতিকল্পে সেখানে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে।

হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের বৈঠকখানায় তখন রীতিমত একটী সভা বসিয়াছে। সকলেই যুক্তি-তর্কদ্বারা তাঁহাকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার জন্য বোঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ওকালতী করিতে হইলে আসামী এবং ফরিয়াদী উভয় পক্ষেই যুক্তি-অছিলার কোন কালেই অভাব হয় না। এস্থলেও পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় প্রকার যুক্তিরই অবতারণা হইতেছিল। প্রতুলচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইবামাত্র হেড্‌মাষ্টার বাবু তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং অপর সকলেও তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলেন।

পূর্ব্ব হইতেই সেখানে আলোচনা হইতেছিল। ডেপুটি বাবু উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন যে জিলাস্কুলের বৃদ্ধ হেড্‌পণ্ডিত নাকে একটিপ্‌ নস্য লইয়া বলিতেছেন—"ভায়াগণ, ওসকল আপনাদের নিতান্তই মনের ভ্রম। সেই বেগুন পোড়ার গল্প শোনা আছে কি?" এই বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সকলে তখন কৌতুহলী হইয়া বলিলেন—"না পণ্ডিত মশাই, আমরা তো সে গল্প কখনও শুনি নাই; তা একবার বলুন না শোনাই যাক।"

হেড্‌পণ্ডিত—"তবে শুনুন। আমি তখন হুগলি জিলাস্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত। ওখান থেকে কাছেই বালি-উত্তরপাড়া। উত্তর

পাড়ার মুখুয্যেরা খুব বড় জমিদার। তাঁদের তখন খুব নাম ডাক। এই সময়ে জমিদার রতন মুখুয্যের পত্নী-বিয়োগ হয়। বয়স তখন তাঁর প্রায় ষাটের কাছাকাছি হবে। বুড়ো তো তখন বিয়ে করতে চাইল। ওদিকে কলিকাতা রায়বাগানের লাহিড়ী মহাশয় তাঁর দশ বছরের মেয়ে রাধারাণীকে বিয়ে দেবার জন্য জমিদার বাড়ীতে হাঁটাহাঁটি স্নরু করেছেন। জমিদার বাবুর ছেলে, মেয়ে, নাতী, নাতনীর অবধি নাই। বাড়ীর আত্মীয়স্বজনরা বলেন এখন তাঁর কোন্ দুঃখে বিয়ে করা? তাঁর সেবার জন্য ভাবনা কি? উপযুক্ত পুত্র-বধূরা আছেন, তাছাড়া দাসদাসী তো আছেই। বুড়ো সে কথার জবাবে বলেন 'বাপু, তোমরা তো এত আছ, তবে আমার বেগুন পোড়াটুকু জোটেনা কেন?'

"বুড়োর বেগুন পোড়া খেতে বড়ই সখ। গৃহিণী বেঁচে থাকতে নিজেই এ ভার নিয়ে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুরপর থেকে যে বেগুন পোড়া বন্ধ হয়ে গেছে তাইতো এখন বিয়ের দরকার। নইলে কি আর এ বয়সে……রাম বল, একথা কেউ ভাবতে পারে? বউদের বলে বলে কিছু ফল হয় না, তারা কেবলই ভুলে যায়। একথা শুনে মেয়েরা বাপের বাড়ী এসে বল্লে—বাবা, ভাবনা কি? আমরা তিন বোন আছি, পালা করে তোমার কাছে থাকব। তোমার সেবার জন্যে ভেবোনা। কিন্তু হায়, হাজার হলেও গিন্নর অভাব কি আর মেয়ে দিয়ে পূরণ হয়? তারাও ছাই সাধের বেগুন পোড়ার কথা কেবলই ভুলে যায়।

"বুড়ো তখন কারো কথা না শুনে লাহিড়ী মশাইকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করলেন। রাধারাণী যখন স্বামীর ঘর করতে এলেন তখন তাঁর মা বেগুন পোড়ার কথা বিশেষ করে বলে দিতে ভুল্লেননা

গৃহস্থঘরে বেগুন পোড়ান একটা বিশেষ কি কাজ ? ওইটুকু মেয়েতেও তা খুবই করতে জানে, তাই আর তখন থেকে বুড়োর বেগুন পোড়ার অভাব হতো না। মুখুয্যে মশাই তখন একদিন মেয়েবউ সকলকে ডেকে বল্লেন—"দেখ্‌লে আমার কথা ঠিক কিনা ? যাই গিন্নী এল তবেতো আমার ভাগ্যে বেগুন পোড়া জুট্‌ল।"

পণ্ডিত মহাশয়ের গল্প শুনিয়া সকলে হাসিয়া কুটিপাটি। তখন নাকে আর এক টীপ্‌ নস্য লইয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"শুন্‌লেন তো ব্যাপার মশাইরা। এর উপর আর কথা চলে কি ?"

স্থানীয় ডাক্তার শ্রীকান্ত বাবু বলিলেন—"আপনারা যে যাই কন্‌, আমার মতে বিপত্নীকদের বিধবা বিয়া করাই সঙ্গত। না হইলে ষাইট বচ্ছরের বুড়া এক দশ বচ্ছরের মাইয়াকে বিয়া কর্‌লে তার বিধবা হওয়া রাখে কে ? আর বুড়ার সঙ্গে যুবতীর মিশখাইবেই বা ক্যান্‌ ? কাজেই কেলেঙ্কারীর কথাটাও মনে করবেন। মশয়, আমি কই বিদ্যাসাগরের মতে বিয়া করুন। আপনার তো এই বচ্ছর পঁয়ত্রিশ বয়স। এই বয়সের আন্দাজে পনর ষোল বচ্ছরের পাত্রী হইলেই মানাইবে ভাল। আর তা হইলেই সে বউ ঘরে পা দিয়া মাইয়া কোলে করতেও পারবো। তা না হইলে এক আট দশ বচ্ছরের খুকী দিয়া কি কর্‌বেন মশয় ? আপনি কারো কথায় কান পাতবেন না। আমি যা কই তাই করেন, সব দিক রক্ষা পাইবো।"

একথা শুনিয়া প্রতুলচন্দ্রও খুব উৎসাহের সঙ্গে সায় দিলেন। তারপর হেড্‌মাষ্টার বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে, কাল ভোরে যখন বেড়াতে বের হব তখনই আপনার এখানে আসব। আজ তবে উঠি, একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে।" এই বলিয়াই ডেপুটি বাবু প্রস্থান করিলেন।

প্রতুলবাবু একটু আড়াল হইবামাত্র পণ্ডিত মহাশয় আর এক টীপ নস্য নিয়া চোখ টিপিয়া বলিলেন—"ডেপুটি বাবু দেখ্‌ছি হেডমাষ্টার বাবুকে তাঁর দলে ভিড়াবার চেষ্টায় আছেন। নিজের যখন লেজকাটা গেছে তখন সকলেরই লেজ কাটাবার চেষ্টা। সেই যে চাষার ফাঁদে পড়ে শেয়ালের লেজ কেটে গিয়েছিল, তারপর ফাঁদ থেকে বেরিয়ে সব শেয়ালকে ডেকে সভা করে সকলকেই লেজ কাটতে পরামর্শ দিয়েছিল, এযে দেখি তাই হচ্ছে।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি লাঠিগাছটী হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ক্রমে ক্রমে অপর সকলেও গাত্রোত্থান করিয়া সেদিনকার মত হেডমাষ্টার বাবুকে রেহাই দিলেন।

বার

দলপুষ্টি

পরদিন প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াই প্রতুলচন্দ্র প্রথমে হেডমাষ্টার বাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণনাথ বাবুকে ভজাইতে পারিলে তাঁহার দলপুষ্টির সহায় হইবে এবং তখন সম অবস্থাপন্ন দুই জনে একস্থানে থাকিলে পরিবার লইয়া বাস করিবারও অনেকটা সুবিধা হইবে। সামাজিক নির্য্যাতন এবং দলাদলির মধ্যে ও আপদবিপদে পরস্পরের সাহায্যেরও সুযোগ ঘটিবে। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে ডাক্তার শ্রীকান্ত বাবুর কথা বিশেষ করিয়া ভাবিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। এত লোকের সাক্ষাতে এ সকল গুরুতর বিষয়ে স্থির চিত্তে পরামর্শ করা সম্ভব নয় বলিয়াই তিনি তাঁহাকে কাল কিছু বলা সঙ্গত মনে করেন নাই। এইরূপ ভনিতা করিয়া তাঁহার বয়সের উপযুক্ত কন্যা পাইতে হইলে যে বিধবা-বিবাহ করাই সঙ্গত ইহা বুঝাইতে লাগিলেন। এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে যে আইনও বিধিবদ্ধ হওয়ায় বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহা যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করিলেন। তৎপরে ইহাও বলিলেন যে তাঁহারা দুইজন পরস্পরের সহায় হইলে সকল প্রকার সামাজিক নির্য্যাতন অগ্রাহ্য করিয়া তথায় বাস করাও তখন তেমন কঠিন হইবে না।

ডেপুটি বাবুর আবেগপূর্ণ সহানুভূতি ও যুক্তিতর্কের স্রোতে হেড্-মাষ্টার বাবুর মনে এক নূতন তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। তিনি তখন এ বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন বলিয়া

অঙ্গীকার করিলেন। তখন হইতে প্রতুলচন্দ্র প্রায় প্রতিদিন ভ্রমনকালে কৃষ্ণনাথ বাবুর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার মন আকর্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই শারদীয় অবকাশের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। পূজা উপলক্ষে একমাসের জন্য স্কুল বন্ধ হইল। এই সময়ে ফৌজদারী কাছারিও অল্পদিনের জন্য বন্ধ থাকে, তখন প্রতুলবাবুও কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় যাইবেন স্থির করিলেন। এই ছুটী উপলক্ষে সে সময়ে কৃষ্ণনাথ বাবুকেও কলিকাতায় যাইবার জন্য তিনি বিশেষ ভাবে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণনাথ বাবুর শিশুকন্যাকে তাঁহার ভ্রাতৃজায়া দুর্গামণির কাছে রাখিয়া না আসিলেই নয়, তাই তাঁহার দেশে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

ফৌজদারী কাছারি ছুটী হইবার প্রায় একসপ্তাহ পূর্ব্বেই স্কুল বন্ধ হইয়া থাকে। কাজেই কৃষ্ণনাথ বাবু প্রথমে দেশে গিয়া সপ্তাহ পরে অনায়াসেই কলিকাতায় যাইতে পারেন প্রতুলচন্দ্র এই বলিয়া তাঁহার সে প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থিত করিয়া 'ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়' এই নীতিবাক্যের দোহাই দিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনাথ বাবু তখন অনেক ভাবনাচিন্তার পর প্রতুলচন্দ্রের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন।

কাছারি ছুটী হইবা মাত্র প্রতুলচন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। যে দিন তিনি পৌছিলেন সেই দিনই কৃষ্ণনাথ বাবুকে আসিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া এক চিঠি লিখিলেন।

পর দিন প্রতুলচন্দ্র রণবীর শর্ম্মার সহিত দেখা করিতে গিয়া শুনিলেন যে হাইকোর্টের উকীল সিমলা চুলিপাড়ার হরিদয়াল গুহ মহাশয়ের একমাত্র সন্তান কন্যা সোণামণি বিবাহের এক বৎসরকাল

মধ্যেই বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। উকিল বাবুর অতি আদরের কন্যা এই সোণামণি। কত অর্থব্যয় করিয়া ভাল ঘরে ভাল বরে তাঁহাকে পাত্রস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু হায় অদৃষ্ট! বৎসর ফিরিতে না ফিরিতেই সেই কন্যাকে পতিহারা হইয়া চিরবৈধব্যবরণ করিতে হইল! কন্যার দিকে চাহিতে পিতার বুক ফাটিয়া যায়। তাহার যে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে বালিকা নিজে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতেও পারে না, কিন্তু পিতা যে তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চক্ষে আঁধার দেখিতেছেন। অসহ্য শোকের তাড়নায় তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন সমাজের সকল নির্য্যাতন উপেক্ষা করিয়া পুনরায় কন্যার বিবাহ দিবেন। একথা শুনিয়া প্রতুলচন্দ্র কৃষ্ণনাথ বাবুকে অবিলম্বে কলিকাতায় আসিবার জন্য পুনরায় এক চিঠি লিখিলেন।

কৃষ্ণনাথ রায়ের বাড়ী ময়মনসিংহ জিলার মহম্মদপুর গ্রাম। তাঁহারা তিন সহোদর—শক্তিনাথ, কৃষ্ণনাথ এবং হরনাথ। তিন ভাইয়ের আকৃতি এবং প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জ্যেষ্ঠ গৌরবর্ণ, দীর্ঘায়তন, বলিষ্ঠকায়; মধ্যম কৃষ্ণবর্ণ, নাতিদীর্ঘ, স্থূলকায় এবং কনিষ্ঠ শ্যামবর্ণ, খর্ব্বাকার, কৃশকায়। জ্যেষ্ঠ তেজীয়ান, নির্ভীক ও উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন; মধ্যম অমায়িক, হৃদয়বান ও ধী-শক্তিসম্পন্ন এবং কনিষ্ঠ নীরিহ, সদানন্দ ও ধৈর্য্য-শক্তিসম্পন্ন! জ্যেষ্ঠ শক্তিনাথ বাড়ীতে থাকিয়া বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করেন এবং নিজের দাপটে গ্রামবাসীকে সন্ত্রস্ত রাখেন। মধ্যম কৃষ্ণনাথ রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন এবং বিদেশে থাকিয়া শিক্ষকতা করেন। কনিষ্ঠ হরনাথ গ্রামের পাঠশালায় গুরুগিরি করেন এবং নিবিষ্টচিত্তে ছিপ দিয়া মাছ ধরেন। জ্যেষ্ঠ কৃতদার, মধ্যম বিপত্নীক এবং কনিষ্ঠ অকৃতদার।

কোম্পানীর আমলে যে সদর রাস্তা ময়মনসিংহ শহরের গোদারা-

ঘাট পার হইলেই ব্রহ্মপুত্রনদের পূর্ব্বতীর হইতে আরম্ভ হইয়া ঈশ্বরগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহারই ডান দিকে মহম্মদপুর গ্রাম। কোম্পানীর সড়কের মধ্যপথ হইতে দক্ষিণ দিকে যে রাস্তা গিয়াছে তাহার পার্শ্বেই চারিদিকে জলাশয় এবং নারিকেল-বাগি-বেষ্টিত যে বাড়ীটি দেখিতে পাওয়া যায় উহাই প্রসিদ্ধ রায়-বাড়ী। এই বাড়ীর পূর্ব্বদিকে পুরাতন 'ভৈরবী দীঘী'। কৃষ্ণনাথ রায়ের মাতার নামে এই দীঘীর নামকরণ হইয়াছিল। ইহার অনুকরণে শক্তিনাথ দক্ষিণেও একটী প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করাইয়া স্ত্রী দুর্গামণির নামানুসারে তাহার নাম রাখিয়াছেন 'দুর্গাদহ'। গ্রামের লোকেরা ইহাকে 'গঙ্গাসাগর' বলে। উত্তরে লুপ্ত নদীর আকারে একটী জলা—নাম 'কেন্দুয়া' এবং পশ্চিমেও একটী অতি প্রাচীন পুষ্করিণী, তাহার তলদেশ গোলামকুচিতে পরিপূর্ণ। দেখিয়া মনে হয় কোন কালে হয়তো ওখানে কুমারের পাঁজা ছিল।

মহম্মদপুরের পশ্চিমে গাজীপুর গ্রাম। উক্ত গ্রামের পশ্চিমে এক মাইল দূরে দুইটী প্রাকৃতিক জলাশয়—নাম 'শুকদেবের ডোবা' এবং 'নন্দ রামের ডোবা'। একটী ডোবা হইতে অপরটি আধমাইল ব্যবধান। কিন্তু প্রকৃতির কি অদ্ভুত লীলা! ইহার একটী ডোবাতে যখন ধীবরেরা জাল ফেলিয়া মাছ ধরে এবং তজ্জন্য উহার জল ঘোলা হইয়া যায় তখন অপর ডোবাটির জলও আপনা হইতে ঘোলা হইয়া পড়ে! এই ডোবা দুইটীতে প্রচুর মৎস্য থাকায় হরনাথ ছুটীর দিন হইলেই তথায় মাছ ধরিতে যাইতেন। ডোবা দুইটী এখনও সমভাবে বর্ত্তমান এবং বৈজ্ঞানিক-দিগের একটী গবেষণার বিষয়। সর্ব্বদা বড়শী হাতে দেখিয়া নাতি-নাতিনীরা হরনাথকে 'বড়শীদাদা' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছে।

কন্যা গুণমণিকে লইয়া কৃষ্ণনাথ যে দিন বাড়ী পৌঁছিলেন জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া দুর্গামণি সেদিন তাঁহার স্নেহ-কোমল উদার বক্ষে সেই মাতৃ-

হারা শিশুকে টানিয়া লইলেন। দেবর কৃষ্ণনাথ বরাবরই 'বউঠাকরুণ'কে অতি শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন এবং দেবী-প্রতিম সেই মমতাময়ীর প্রাণের ঐকান্তিক টানে তিনি তাঁহার নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। এই পত্নীবিয়োগ বিধুর দেবরকে দেখিয়া দুর্গামণির স্নেহ-প্রবল হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হইল। তিনি দেবরকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে আজ হইতে গুণমণির সকল ভার তিনি গ্রহণ করিলেন, এক্ষণে নিশ্চিন্ত মনে উপযুক্ত পাত্রী দেখিয়া কৃষ্ণনাথ নূতন করিয়া সংসার পাতুন। আর একথাও বলিলেন যে এই শিশুকন্যাকে কখনও তিনি নিজের স্নেহাঞ্চল ত্যাগ করিতে দিবেন না, কাজেই কন্যার জন্য কোন দিনই তাহাদের অশান্তির কারণ ঘটিবে না।

ইহার কিছুদিন পরেই প্রতুল বাবুর চিঠি পাইয়া কৃষ্ণনাথ বাবু কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। কলিকাতায় আসিবার পর প্রতুলবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে বিবাহ সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। অবশেষে কৃষ্ণনাথ বাবু জানাইলেন যে তিনি বিধবা-বিবাহ করিতেই মনস্থির করিয়াছেন। এখন যদি উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া যায় এবং কন্যা পক্ষের কোনও আপত্তি না থাকে তাহা হইলে পূজার ছুটীতেই বিবাহ করিতে তাঁহার বিশেষ আপত্তি নাই।

সুযোগ বুঝিয়া প্রতুলচন্দ্র কৃষ্ণনাথ বাবুকে ধরিয়া বসিলেন যে এই সোণামণিকে তাঁহাব বিবাহ করিতেই হইবে। দশ বৎসর বয়সে বালিকা বিধবা হয়, এক্ষণে তাহার বয়স পনর। একে তাহার পূর্ণ যৌবন, তাহাতে আবার কন্যাটী দেখিতেও স্বভাবতঃ সুন্দরী। এদিকে পিতাও একজন বিশেষ সঙ্গতিপন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কাজেই এই বিবাহ সংঘটন হইতে প্রতুলচন্দ্রকে অধিক বেগ পাইতে হইল না।

ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নব প্রবর্ত্তিত মতে সোণামণির

সহিত কৃষ্ণনাথ রায়ের যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল। নায়ক-নায়িকার প্রেমের বর্ণনাই উপন্যাসের প্রাণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা সে নিয়ম রক্ষা করিতে নিতান্তই অসমর্থ। কারণ আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে আদিকালের স্বয়ম্বর প্রথাও প্রচলিত ছিল না আর বর্ত্তমানের নভেলি প্রেমের প্রথাও এদেশে তখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কাজেই বিবাহের পূর্ব্বে 'পূর্ব্বরাগ' হইবার পক্ষে সাহিত্য ও সমাজ উভয়ের কিছুই তখন অনুকূল ছিল না। এ অবস্থায় আশা করি কেহ আমাদের এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

বিবাহের ছয় মাস পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুপারিশে কৃষ্ণনাথ রায় হেড মাষ্টারী হইতে ডেপুটীগিরির পদে উন্নীত হইলেন এবং বগুড়া হইতে কুমিল্লায় বদলী হইয়া গেলেন। উভয়ের একস্থানে কর্ম্মস্থল হইবে এবং একজন নিজের দলের লোক পাইলে পরিবার লইয়া বাস করিবার সুযোগ ঘটিবে প্রতুলবাবুর সে সাধের কল্পনা একেবারে ঘুচিয়া গেল।

তের

নির্য্যাতন ও প্রতীকার

এই বিবাহের কথা যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল তখন কলিকাতার ন্যায় মফঃস্বল-শহরে এবং ক্রমে পল্লীগ্রামেও মহা আন্দোলন আরম্ভ হইল। ইহার ফলে উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজনকেও বহু নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইল। দেশে তাঁহাদের গুরু-পুরোহিত, ধোপা-নাপিত সমস্তই বন্ধ হইল এবং যদিও তাঁহারা বিবাহের কোন সংস্রবেই ছিলেন না তথাপি তাঁহাদিগের উপর রীতিমত উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। ছাপরবন্ধ (ঘরামী) ঘর ছায়না, ভারবাহী ভার বহন করেনা, গৃহকর্ম্মের চাকর জুটে না, এইরূপে তাঁহাদের আর নিগ্রহের সীমা রহিল না। ময়মনসিংহ জিলায় এই সর্ব্বপ্রথম বিধবা-বিবাহ। সন ১২৭৩ সন এই ঘটনায় বিশেষ স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। সেখানে তখন এমন প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল যে এই বিবাহঘটিত ব্যাপার লইয়া কবিগানের এক 'পালা' রচিত হইয়া সর্ব্বত্র গীত হইতে লাগিল।

দেশের জমিদারগণই সাধারণতঃ সমাজপতিরূপে গ্রামের উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন। শক্তিনাথ এই অযথা অত্যাচারের প্রতীকারার্থ প্রথমে অপেক্ষাকৃত পাশ্চাত্য আবহাওয়ার আওতায় পরিপুষ্ট জমিদার তারিণীকান্ত রায় মহাশয়ের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন তারিণীকান্ত আহার-বিহারে আচার রক্ষা করিয়া চলিতেন না তথাপি সমাজে তাঁহার প্রতিপত্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয়

নাই। বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে শক্তিনাথ নিজে কোনই অনাচারদুষ্ট নহেন এবং ভ্রাতার বিবাহে তিনি যোগদানও করেন নাই। কিন্তু শক্তিনাথের সকল কথা শুনিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও কার্য্যকালে দেখিলেন এই 'একঘরে' করিবার ব্যাপারে প্রতিপক্ষের প্রতিবাদ করিতে জমিদার তারিণীকান্তও নিতান্ত কুণ্ঠিত, অপর জমিদারবর্গের ত কথাই নাই। তবে এ বিষয়ে মসীপুরের জমিদার বাবুরাই ছিলেন বিশেষ অগ্রণী। শক্তিনাথ এই অযথা অবিচারের প্রতিশোধ লইতে তখন দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন এবং সকল অসুবিধা অবহেলাভরে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন; কাহারও কাছে আর কোনও প্রতীকারের আবেদন উপস্থিত করিলেন না। ঘটনাচক্রে মাস ছয় পরেই সমাজের দলপতিকে জব্দ করিবার এক মহা সুযোগ উপস্থিত হইল।

দামগাঁয়ের ভোলানাথ বিশ্বাস একজন জোতদার। তাঁহার মরাই ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু। তিনি জমিদার তারিণীকান্ত রায় মহাশয়েরই একজন প্রজা। মহম্মদপুরের শক্তিনাথ রায়ের সহিত ইহার বিশেষ ভাব। শক্তিনাথের দুর্দ্দণ্ড প্রতাপে যেমন গ্রামবাসী কম্পমান, ভোলানাথের নামেও তেমনি প্রজাগণ সন্ত্রস্ত।

মহম্মদপুর গ্রামের দক্ষিণে একক্রোশ দূরে 'দৈয়লবিল' নামে প্রকাণ্ড এক বিলের চারি পার্শ্বে অতিশয় উর্ব্বরা বহু বিস্তৃত ধান জমি। পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের বহু জমিদার এই সকল জমির মালিক। দৈয়লবিলের পূর্ব্বদিকের বিস্তৃত জলাভূমি পার হইলেই দামগাঁ নামক গ্রাম। মসীপুরের জমিদার কালীকান্ত লাহিড়ী মহাশয় এই বিলের এক অংশের মালিক। তারিনীকান্ত রায় মহাশয়ের দুর্দ্দান্ত প্রজা ভোলানাথের সহিত কালীকান্ত লাহিড়ী মহাশয়ের প্রজাদিগের এই বিলের জমা লইয়া প্রায়ই বিবাদ ঘটিয়া থাকে।

দুর্গোৎসবের সময় জমিদার বাড়ীতে, বাই-খেমটা, যাত্রা ও কবি গান ইত্যাদি নানা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয় এবং প্রজাগণ তাহাতে যোগদান করিয়া থাকে। সেবার অষ্টমী-পূজার দিন সন্ধ্যাকালে ভোলানাথ ও শক্তিনাথ উভয়েই মসাপুরের জমিদার বাড়ীতে যাত্রা গান শুনিতে যান। প্রথম রাত্রিতে বাবুদের সম্মুখে বাই-খেমটা নাচ হইবার পর গভীর রাত্রিতে যাত্রাগান আরম্ভ হইয়া থাকে। সেদিন যাত্রাগান আরম্ভ হইতে একটু অতিরিক্ত বিলম্ব ঘটিল। ভোলানাথ তখন বাড়ী ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং শক্তিনাথের একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সেই রাত্রিতেই তিনি চলিয়া আসিলেন। অত রাত্রিতে তাঁহার একাকী যাওয়া কিছুতেই উচিৎ নয়, কারণ তাঁহার পশ্চাতে সর্ব্বদাই শত্রু অনুসরণ করিতেছে—একথা শক্তিনাথ বিশেষ করিয়া বলিলেন। কিন্তু শক্তিনাথের অনুরোধ বা যুক্তিতর্ক কিছুতেই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। চারিদিকেই ভোলানাথের শত্রু, কারণ প্রজাগণ যেমন তাঁহার দুর্ব্যবহারে মনে মনে উত্তেজিত হইয়া আছে, জমিদারগণও তাঁহার দুঃসাহসের সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য তেমনি উৎসুক হইয়া আছেন! কোন রূপেই তাঁহাকে জব্দ করিতে না পারিয়া জমিদার বাবুরা অবশেষে 'লাঠ্যৌষধম্' এর ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

নায়েব মহাশয় বহুদিন হইতেই শিকারের প্রতীক্ষায় ছিলেন। আজ গভীর রাত্রিতে একাকী ভোলানাথকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া তিনি এই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া কয়েকজন সরকারী লাঠিয়াল এবং দামগাঁয়ের উপস্থিত দুইজন বিশ্বস্ত প্রজাকে আড়ালে ডাকিয়া তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে আদেশ দিলেন। যাহাতে তাহাকে উত্তম রূপে শিক্ষা দিতে কোনও ত্রুটি না হয় এবং এবিষয়ে সফলকাম হইলে

বিশেষ পুরস্কার লাভেরও যথেষ্ট আশা আছে নায়েব মহাশয় একথা বলিয়া দিতেও ভুলিলেন না। তবে শেষ কালে এইটুকু সাবধান করিয়া দিলেন যে এমনভাবে প্রহার করিবে যাহাতে তাহাকে চিরজীবনের মত পঙ্গু হইয়া থাকিতে হয়, কিন্তু কিছুতেই যেন প্রাণে মারা না যায়।

ভোলানাথ মসাপুর হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই পাঁচটি লোক বরাবর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার অনুসরণ করিয়া চলিল। রজনী গভীর, অষ্টমীর চন্দ্র তখন পশ্চিমাকাশের দিগ্বলয় অতিক্রম করিয়াছে। ঊর্দ্ধে শরতের মেঘবিমুক্ত নির্ম্মল গগনে অগণিত নক্ষত্ররাজি মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে, এবং নিম্নে তাহারই প্রতিচ্ছায়ারূপে বৃক্ষশাখাস্থিত অসংখ্য খদ্যোত পথ-প্রান্তর বনভূমি আলোকিত করিবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছে। সে অস্পষ্ট আলোকে দূরের কোন জিনিষই সম্যক দেখা যাইতেছে না। আতপ তাপে ক্লান্ত পথিকের শ্রান্তি-বিনোদনের জন্য পথ-পার্শ্বে রোপিত মহীরুহ সকল নীরব-নিথরভাবে দণ্ডায়মান। সেই স্তব্ধ নিশীথে নির্জ্জন-পথে চলিতে চলিতে ভোলানাথ নিজের নিঃশ্বাসের শব্দেই চমকিয়া উঠিতেছিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই পশ্চাতে পদশব্দ শ্রুত হইল। তিনি তখন পথের সাথী মিলিল ভাবিয়া মনে মনে একটু আরাম বোধ করিলেন এবং তাহাদের আগমন প্রতীক্ষায় তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া গেলেন। কিন্তু তিনি দাঁড়াইবা মাত্র সে পদশব্দও থামিয়া গেল। তৎপর কিছুকাল অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিলেন যে কেহ সে দিকে আসিতেছে না, তখন নিজের ভ্রান্তি ঘটিয়াছে ভাবিয়া পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই আবার সেইরূপ পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। শব্দলক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইবা মাত্র সে শব্দও অকস্মাৎ থামিয়া গেল। ক্রমাগত কয়েকবার এইরূপ হইবার পর তিনি ভাবিলেন ইহা নিতান্তই

তাঁহার মনের ভ্রম—অলক্ষ্যে মনে ভীতির সঞ্চার হওয়াতেই এইরূপ বোধ হইতেছে। তখন লজ্জিত হইয়া মনে মনে নিজকেই ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং মনকে সাহসে উদ্বুদ্ধ করিয়া দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিছুতেই পশ্চাতের দিকে আর ফিরিয়া তাকাইলেন না।

এইরূপে বহুক্ষণ পথ চলিবার পর ভোলানাথ সদর রাস্তা অতিক্রম করিয়া গ্রামের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে আঁকা-বাঁকা পথ, কোথাও বা ধান এবং কোথাও বা পাটক্ষেতের আলদিয়া কোথাও বা জলাভূমির পাড় দিয়া গ্রামের ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। এই পথে একটু অগ্রসর হইতেই একস্থানে দুই দিকেই পাটক্ষেত। এইস্থানে আসিবামাত্র প্রকৃতির প্রয়োজনে তিনি পথের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া সেই ক্ষেতের পাশে বসিলেন।

ইহার মুহূর্ত্তকাল পরই হঠাৎ পিছন দিক হইতে কে আসিয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। আততায়ীগণ তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। এই অতর্কিত আক্রমণে তিনি তখন চেঁচাইতেও পারিলেন না, কিম্বা আত্মরক্ষার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টাও করিতে পারিলেন না। শত্রুগণ তখন একেবারে কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া এমন নৃসংশভাবে তাঁহাকে হত্যা করিল যে সেই লোমহর্ষণ অমানুষিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

কিছুকাল পরে ভোলানাথকে সম্পূর্ণ মৃতবৎ দেখিয়া দুর্বৃত্তদের কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইল এবং মনে ভীতির সঞ্চার হইল। কারণ তাঁহাকে একেবারে প্রাণে মারিবার কথা নায়েব মহাশয় বারম্বার নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহারা সেই শবদেহ

ধরাধরি করিয়া নিকটবর্ত্তী এক গৃহস্থের আঙ্গিনার বহির্ভাগস্থিত গোয়াল-ঘরে লইয়া গেল এবং সেখানে তাঁহাকে সেক-তাপ দিয়া চাঙ্গা করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু যখন কিছুতেই কিছু হইল না তখন নিতান্ত ভীত হইয়া সে শবদেহ স্কন্ধে তুলিয়া লইল এবং সেই রাত্রিতেই জমিদার কালীকান্ত লাহিড়ী মহাশয়ের নায়েব-বাড়ীতে নিয়া উপস্থিত করিল।

সে খুনের 'লাস' দেখিয়াই নায়েব মহাশয়ের ত চক্ষুস্থির! কি সর্ব্বনাশ, একেবারে খুন!! পুনঃপুনঃ সাবধান করিয়া দিবার পরেও তাহারা কেন এমন দুষ্কর্ম্ম করিয়া বসিল এই বলিয়া নায়েব তখন তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং এ খুনের দায় এখন তাহাদের নিজের মাথায় লইয়া যাহা ইচ্ছা করুক তিনি ইহার কোনও সংশ্রবে থাকিবেন না—এই বলিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। হত্যাকারীরা তখন উত্তেজিত হইয়া বলিল যে তাহারা ত তাঁহারই হুকুম তামিল করিয়াছে, এখন তাহাদিগকে দোষী করিয়া নিজে সরিয়া পড়িলে চলিবে কেন? তবে রইল লাস্ এখানে, নায়েব মশাই যা খুসী করুন, তাদের এমন কি দায়? এই বলিয়া সকলে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

নায়েব তখন মহা বিপদ গণিলেন। এ দায় এড়ানো তাঁহার পক্ষে বড় সহজ হইবে না সেকথা বেশ বুঝিলেন। তখন নিরুপায় হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন যে তাহাদের কোনও ভয় নাই, তিনিই ইহার সকল ঝুঁকি নিজের ঘাড়ে লইবেন। তবে উপস্থিত এখন লাসটাকে গোপন করিতে হইবে।

তাহার পর সকলে পরামর্শ করিয়া উহাকে তিনটুকরা করিয়া কাটিল এবং তিনটি ছালাতে (থলিয়া) পুরিয়া মসীপুর হইতে তিন মাইল দূরে ভাঙ্কোয়া বিলের ভিতর ফেলিয়া আসা স্থির হইল। কিন্তু

তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে, এতদূর লইয়া যাইতে হইলে রজনী প্রভাত হইয়া যাইবে। অনেক ভাবিয়াচিন্তিয়া শেষকালে স্থির হইল যে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী একটী হাতীতে করিয়া উহা লইয়া যাইতে হইবে। তখন তাহাই করা হইল এবং বিলের ভিতর দামের তলায় এমন ভাবে রাখা হইল যাহাতে আর কাহারো তাহা জানিবার সম্ভবনা রহিল না।

প্রথম দিন বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীর লোকেরা মনে করিল তিনি জমিদার বাড়ীতেই আছেন। কিন্তু সারাদিনেও যখন আসিলেন না তখন তাঁহার সন্ধান লইতে জমিদার বাড়ীতে লোক পাঠান হইল। সে লোক ফিরিয়া আসিয়া যখন বলিল যে তিনি সেই রাত্রিতেই সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছেন তখন সকলে মহা ভাবনায় পড়িলেন। পর দিনও যখন তাঁহার কোনই খবর পাওয়া গেল না তখন মহম্মদপুরের শক্তিনাথ রায়ের কাছে লোক পাঠান হইল।

শক্তিনাথ লোকমুখে সকল কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন এবং তাঁহার মনে হইল যে সে রাত্রিতে ভোলানাথকে একলা পাইয়া নিশ্চয়ই তাঁহাকে খুন করা হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ থানায় সংবাদ দিতে বলিলেন এবং নিজে ভিতরে ভিতরে সন্ধান লইতে লাগিলেন। লাস বাহির করিতে না পারিলে খুনের কিনারা করা যাইবে না একথা তিনি বুঝিলেন। তাই সর্ব্বাগ্রে সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এখন যে সকল স্থান ঈশ্বরগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত সে সকল তখন মাদারগঞ্জ থানার এলাকায় ছিল। কাজি আবদুলগফুর তখন মাদারগঞ্জ থানার দারোগা। এই খুনের সংবাদ পাইয়াই তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া দামগাঁয়ে আসিয়া হাজির হইলেন। কনেষ্টবল হরি সিং ও করিমবক্স সঙ্গে আসিল। দারোগা সাহেব গ্রামে আসিয়াই বুঝিলেন এ গুম-

খুনের মামলা এবং মসীপুরের জমিদার বাবুরা ইহাতে বিশেষভাবে জড়িত। তখন মনে মনে খুসী হইয়া গোঁফে চাড়া দিতে দিতে ভাবিলেন এবার রুই কাত্‌লা জালে পড়িয়াছে, হুসিয়ার মত জাল গুটাইতে পারিলে তাঁহার নূতন বিবির জন্য কয়েকভরি সোণার আর ভাবনা কি? তা ছাড়াও যে কিছু হাসিল হইবে না তাহাও নয়।

এক সপ্তাহ ক্রমাগত তদন্ত করিয়াও কাজি সাহেব লাসের কোনই কিনারা করিতে পারিলেন না। কত খাল-বিল জলাশয়ে জাল ফেলা হইল, কত ঝোপজঙ্গল পাতিপাতি করিয়া খোঁজা হইল, কিন্তু কিছুতেই সুরাহা হইল না। দারোগা সাহেব নিরাশ হইয়া তখন সদরে এত্তেলা করিলেন। হাতকাটা রাইলী সাহেব তখন পুলিসের বড় সাহেব। তাঁহার দুদ্দান্ত প্রতাপে সকলে তটস্থ থাকিত। ত্তোরা পাহাড়ে কুকীদের সহিত যখন ইংরাজের সশস্ত্র পুলিসের লড়াই হয় তখন রাইলী সাহেব উহার অধিনায়ক ছিলেন। পাহাড়ে উঠিবার সময় কুকারা এক প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ উপর হইতে গড়াইয়া দেয়। উহা তাঁহার বাম হস্তের উপরে পড়াতে সে হাতখানি একেবারে ভগ্ন হইয়া যায় এবং তাহার ফলে হাতখানা কাটিয়া ফেলিতে হয়। তখন হইতে তিনি হাতকাটা রাইলী সাহেব নামে খ্যাত হন।

গুম-খুনের সংবাদ পাইবামাত্র পুলিস সাহেব কোতোয়ালীর দারোগাকে তদন্তে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন এবং একজন প্রতাপান্বিত জমিদার উহাতে সংস্কৃষ্ট জানিয়া পর দিবস নিজেই সরে জমিন তদন্তে বাহির হইলেন। সদরের দারোগা মহম্মদপুরের শক্তিনাথকে বিশেষ ভাবে জানিতেন, কারণ মহম্মদপুর তখন সদরের এলাকাভুক্ত ছিল। তিনি দামগায়ে গিয়া যখন জানিলেন যে ভোলানাথ বিশ্বাস শক্তিনাথেরই একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন তখন প্রথমেই শক্তিনাথের সহিত দেখা

করা আবশ্যক মনে করিয়া দারোগা বাবু সেই দিনই মহম্মদপুরে চলিয়া আসিলেন। নিরপরাধের প্রতি অযথা নির্য্যাতনের প্রতিশোধ লইবার এই মহা সুযোগ ভাবিয়া শক্তিনাথ তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন।

রাইলী সাহেব যেদিন মসীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ঠিক তাহার পর দিনই ঘটনাক্রমে লাস বাহির হইয়া পড়িল।

পূর্ব্বদিন চিরপ্রথা মত হাটে ঢোল পিটাইয়া জানান হইয়াছিল যে পরদিন ভাঙ্কোয়া বিলে মাছ ধরা হইবে। সে দিন সকাল হইতেই চারিদিকের গ্রামে সিঙ্গা বাজিতে লাগিল এবং ক্রমে চারিদিক হইতে বিলের মধ্যে লোক জমিতে আরম্ভ হইল। জেলেরা মাছ ধরিতে শিব-জাল (ধর্ম্মজাল), ঝাঁকি-জাল, বেড়-জাল ইত্যাদি জাল ফেলিয়া বিল তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে। কৃষকেরা ভেসাল, জালি, পলো, কোঁচ, টেঁটা ইত্যাদি লইয়া মাছ ধরিতে আসিয়াছে। দামের তলায় বড় বড় কইমাছ থাকে, তাহা ধরিবার জন্য একজন দামের তলার দিকে জালি চালাইয়া দেয় এবং আর একজন উপর হইতে দামগুলি তুলিয়া ঝাঁকি দিতে থাকে। এইরূপ করিতে গিয়া এক জায়গায় দাম নাড়া দিবামাত্র ভয়ানক দুর্গন্ধ উঠিতে লাগিল এবং যে জালি ঠেলিতেছিল তাহার পায়ের তলায় কি যেন আটকাইয়া গেল। সে তাহা তুলিতেই দেখিল একটা ছালার ভিতর কি যেন রহিয়াছে আর তাহা হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। উহা জল হইতে তুলিলে দেখা গেল যে তাহাতে একটা মানুষের কাটা হাত-পা রহিয়াছে। তখন চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া গেল!

তারপর পুলিস আসিয়া ক্রমে অপর দুইটা থলিয়াও সেখান হইতে উদ্ধার করিল। লাস পাইবামাত্র পুলিস সাহেব আনন্দে লাফাইয়া

উঠিলেন। তখন রীতিমত সুরথাল আরম্ভ হইল। দারোগাকে সরে জমিন তদন্তে রাখিয়া রাইলী সাহেব সদরে চলিয়া আসিলেন। লাস উদ্ধার হইল বটে কিন্তু কে বা কাহারা যে খুন করিল তাহা কিছুতেই ধরিতে পারা গেল না। খুনের কিনারা হইতে বিলম্ব দেখিয়া সদর হইতে একজন পুলিস ইন্সপেক্টর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দারোগা এবং ইন্সপেক্টর কেহই যখন আততায়ীদিগের কোনও সন্ধান করিতে পারিলেন না তখন স্বয়ং শক্তিনাথ একাজে লাগিয়া গেলেন। তিনি বিলের কাছে গিয়া দেখিলেন যে সেখানে হাতীর পায়ের দাগ রহিয়াছে। সেই দাগ ধরিয়া বরাবর চলিতে চলিতে মসী-পুরের জমিদার বাড়ীর খানিক দূর পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া পুনরায় সে দাগগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে একটা হাতী বরাবর মসীপুরের দিক হইতে বিল পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাহার পর শক্ত মাটী ও সদর রাস্তার উপরে আর কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইহার পর শক্তিনাথের আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি তখন ইন্সপেক্টরকে বলিলেন যে মসীপুরের জমিদার বাবুকে গ্রেপ্তার করিলে সকল কথাই বাহির হইয়া পড়িবে। কিন্তু অজস্র রজতচক্রের মহিমাবলেই হউক অথবা এমন একজন পদস্থ ব্যক্তিকে সহসা ধৃত করিবার সাহসের অভাবেই হউক দারোগা বা ইন্সপেক্টর বাবু এ কাজে অগ্রসর হইলেন না। কয়েকদিন পরই ইন্সপেক্টর বাবু অন্যত্র জরুরী কাজ উপস্থিত হওয়ায় চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। এদিকে ইন্সপেক্টর বাবু চলিয়া যাওয়ার পরদিনই পুনরায় রাইলী সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন শক্তিনাথ তাঁহাকে

সকল কথা বুঝাইয়া বলিতেই সাহেব উৎসাহে শক্তিনাথের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন যে তিনি এই খুনের আস্কারা করিয়া দিলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ দারোগা করিয়া দিবেন।

হাতীর পায়ের দাগ দেখিয়া জমিদার বাবুকে ধরা সঙ্গত হইবে কিনা পুলিস সাহেব স্থির করিতে না পারিয়া শক্তিনাথকে বলিলেন যে এখানে কত জমিদার আছে আর তাহাদের সকলেরই গণ্ডায় গণ্ডায় হাতী রহিয়াছে ; এ অবস্থায় কাহার হাতীর পায়ের দাগ তাহাই বা কি করিয়া জানা যাইবে ? তখন শক্তিনাথ সাহেবকে বুঝাইয়া বলিলেন যে সেই পায়ের দাগ যে হাতীর পায়ের মাপের সঙ্গে মিলিয়া যাইবে সেই হাতীর মালিককে ধরিলেই সব প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কারণ এক হাতীর পা অন্য হাতীর পায়ের মাপ হইতে নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র হইবে। তখন সাহেব শক্তিনাথের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই পায়ের চিহ্নের মাপ লইয়া জমিদার বাড়ীর হাতীগুলির পায়ের সহিত মাপিয়া দেখিতে হুকুম দিলেন।

পায়ের মাপ লইতে গিয়া যেদিন ধরা পড়িল যে বিলের ধারে যে হাতী গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে উহা মসীপুরের জমিদার বাড়ীর হাতী সেই দিন বিকাল বেলায় শক্তিনাথের বাড়ীতে জমিদার কালীকান্ত লাহিড়ী মহাশয়ের এক জন পাইক সঙ্গে এক ঘোড়া লইয়া হাজির হইল। জমিদার বাবুর বিশেষ অনুরোধ শক্তিনাথ যেন আজই একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। শক্তিনাথকে ঘোড়া পাঠাইয়া এভাবে আপ্যায়িত করিবার অভিপ্রায় বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কারণ স্বয়ং পুলিস সাহেব এই খুনের জন্য জমিদার বাড়ীতে হানা দিয়াছেন। মাদারগঞ্জের দারোগা সাহেবকে সূচনাতেই যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন-মূল্য দিয়া সহজেই সরাইতে সমর্থ হইলেও এবার শক্তিনাথের সহায়তায় যখন

লাসের সন্ধান হইয়াছে তখন ব্যাপার যে ক্রমে অতি গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল তাহা নায়েব-জমিদার কাহারো আর বুঝিতে বাকী রহিল না। কারণ যাহাদের উপর শক্তিনাথের 'সোবে' হইতেছে তাহাদিগকে স্বীকারোক্তি করাইবার জন্য পুলিস অতি নিদ্দয়ভাবে প্রহার করিতেছে!

এইবারে সত্যসত্যই শক্তিনাথের সুযোগ উপস্থিত হইল। জমিদার বাবু তাঁহাকে অন্দর মহলে লইয়া গিয়া স্বয়ং হাত ধরিয়া অনুরোধ করিলেন যে এই বৃদ্ধ বয়সে যেন তাঁহাকে খুনের দায়ে জড়াইতে না হয় শক্তিনাথকে তাহার উপায় করিতেই হইবে। এজন্য যত টাকার আবশ্যক হয় তাহা তিনি অকাতরে দিতে প্রস্তুত আছেন। শুনিয়া শক্তিনাথ মনে মনে বলিলেন—এখনই কি? আগে হাতে হাতকড়া পড়ুক তবে তো বাছাধন পথে আসবে? শক্তিনাথকে একঘরে করিবার মজা তখন টের পাইবেন। প্রকাশ্যে বলিলেন যে এখন তিনি নিজেই 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল'—তাঁর সব ধোপা নাপিত বন্ধ, এসময়ে খুনের দায় হইতে খালাসের পথ খুঁজিবার সময়ই বা তাঁহার কোথায়? বিশেষতঃ জমিদার বাবুই যখন খুনের প্রধান আসামী এবং উহা প্রমাণ হইতেও আর বিলম্ব হইবে না।

শক্তিনাথের কথায় লাহিড়ীমহাশয়ের মুখ একবারে পাংশু হইয়া গেল, জিভ জড়াইয়া আসিল, গলা শুকাইয়া কাঠ হইল। তিনি তখন তাড়াতাড়ি শক্তিনাথের তুইখানা হাতে নিজের পৈতা জড়াইয়া কাতর ভাবে বলিলেন যে এ বিপদ হইতে যদি শক্তিনাথ তাঁহাকে রক্ষা করেন তাহা হইলে তিনি বাঁচিয়া থাকিতে শক্তিনাথের প্রতি কেহ অত্যাচার করে কি সাধ্য? তাঁহার হাতেই সমাজের চাবিকাঠি, কাজেই শক্তিনাথের গায়ে একটু আঁচড়ও আর লাগিবেনা। শক্তিনাথও

তখন জমিদার বাবুকে নিশ্চিন্ত থাকিতে আশ্বাস দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পর শক্তিনাথ পুনরায় সমাজে 'চল' হইলেন কিন্তু তাঁহাকে পুলিস সাহেবের বিষ নজরে পড়িতে হইল। কারণ তাঁহার সাহায্যে যে সমস্ত সাক্ষীসাবুদ সংগ্রহ করা হইয়াছিল এবং আসামীরাও অনেকে ধরা পড়িয়াছিল, মোকদ্দমা যখন দায়রায় সোপর্দ হইল তখন সে সমস্তই একেবারে ওলটপালট হইয়া গেল। পুলিস-সাহেবের শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রমাণের ফের্‌ফারে প্রকৃত হত্যাকারী সাব্যস্ত হইল না এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে আসামীরা অব্যাহতি লাভ করিল।

চৌদ্দ

পরিণয়-পরিণাম

কাছারি খুলিয়া যাওয়াতে কৃষ্ণনাথ রায়ের বিবাহে প্রতুলচন্দ্র উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। বিবাহের তিন দিবস পরেই কৃষ্ণনাথেরও স্কুল খুলিয়া গেল। কাজেই তাহার আর দেশে ফিরিয়া যাওয়া হইল না, সেখান হইতে বরাবর বগুড়ায় চলিয়া গেলেন। ডেপুটী হইয়া কুমিল্লায় যাইবার সময় কলিকাতা হইতে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। বগুড়ায় প্রতুলচন্দ্র নিতান্ত একা হইয়া পড়িলেন। সেখানে নীরোদবাসীনীকে লইয়া যাইতে আর কিছুতেই সাহসী হইলেন না।

যে উদ্দেশ্যে প্রতুলচন্দ্র কৃষ্ণনাথ রায়কে বিধবা-বিবাহ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহা ব্যর্থ হওয়ায় নিতান্ত দমিয়া গেলেন। এদিকে মুন্সীগঞ্জের সারদানাথ হালদার মহাশয়ের কন্যা উমারাণী একটী চার বৎসরের শিশুপুত্রকে লইয়া এতকাল বাপের বাড়ী পড়িয়া থাকা আর কিছুতেই সঙ্গত মনে করিলেন না। বিশেষতঃ যে দিন শুনিলেন যে স্বামী হাকিম হইয়া বগুড়া শহরে তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার ভাইয়ের বাসার সন্নিকটেই বাস করিতেছেন এবং নিতান্ত একলাটি থাকিয়া নানা অসুবিধা ভোগ করিতেছেন সেই দিনই উমারাণী পিত্রালয় পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। এ বিষয়ে ভ্রাতৃজায়ার সহিত গোপনে অনেক পরামর্শ হইয়া স্থির হইল যে আপাততঃ উমারাণী পুত্রকে লইয়া

দাদার শ্যালকের বাসায় গিয়া উঠিবেন তৎপর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবেন।

উমারাণীর দাদার শ্যালক হরিহর কাঞ্জিলাল রংপুরের ফৌজদারী আদালতের কেরাণী ছিলেন। সম্প্রতি বগুড়ার ফৌজদারীর পেস্কারের পদ প্রাপ্ত হইয়া মাস তিন হইল তথায় আসিয়াছেন। প্রতুলচন্দ্র পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে একদিনমাত্র মুন্সীগঞ্জের হালদার বাড়ীতে দেখিয়াছিলেন। কাজেই কাঞ্জিলাল মহাশয় যখন বগুড়ায় পেস্কার হইয়া আসিলেন তখন ডেপুটীবাবু তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই এবং পেস্কার মহাশয়ও ইচ্ছা করিয়াই আত্মপরিচয় গোপন রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী প্রতুলচন্দ্রের কথা জানিতে পারিয়া ননদকে সে কথা না জানাইয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না।

যে দিন কৃষ্ণনাথ বাবু বগুড়া হইতে শেষ বিদায় লইলেন সেই দিন সন্ধ্যার সময় একখানা পর্দ্দাঢাকা গরুর গাড়ী নাটোর হইতে বগুড়ার সদর রাস্তা দিয়া আসিতে দেখা গেল। গাড়োয়ানের পশ্চাতে পর্দ্দার বাহিরে একটী নগ্ন শিশু বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে পর্দ্দা সরাইয়া কি বলিবার চেষ্টা করিতেছে। ভিতর হইতে একখানা শাঁখাপরা রাঙ্গা হাত তাহাতে বাধা দিয়া পুনরায় পর্দ্দাটী টানিয়া দিতেছে। কাছারির কাছে আসিয়াই গাড়োয়ান গাড়ী থামাইয়া একজন পাহারাওয়ালাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ও বাই, পেস্কার বাবুর বাসাডা কোয়ানে?" পেস্কার বাবুর নাম শুনিয়াই কনেষ্টবল নিজের মেজাজ সামলাইয়া লইল এবং সহজেই গাড়োয়ানকে সে বাসার সন্ধান বলিয়া দিল।

কৃষ্ণনাথ বাবু চলিয়া যাওয়াতে প্রতুলচন্দ্র নিজকে নিতান্তই নিঃসঙ্গ মনে করিতে লাগিলেন। কোনও কাজেই আর মনঃসংযোগ করিতে পারেন না। মনটা কেবলই যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতেছে। পরদিন কাছারি

হইতে আসিয়া জলযোগান্তে অবসাদভরে তাকিয়া ঠেসান্ দিয়া অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। তৎপর উঠিয়া বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিলেন। অন্যদিন বিকাল বেলায় স্কুলের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন, তৎপর আসিয়া সংবাদপত্র এবং ডাকের চিঠি পত্র থাকিলে তাহা পাঠ করিতেন। আজ আর বেড়াইতে যাইতেও ইচ্ছা হইল না। খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া পুনরায় ঘরে গিয়া বসিলেন।

বগুড়ায় বিকাল বেলায় ডাক বিলি হইত। প্রতিদিন ডাকে কলিকাতা হইতে একখানা ইংরাজী সংবাদপত্র আসিত এবং মাঝে মাঝে চিঠিপত্রও আসিত। সে দিন প্রতুলচন্দ্র পুনরায় বসিয়া চোখ বুজিয়াছেন এমন সময় আফিসের আর্দ্দালী রামলাল ডাক লইয়া আসিল। ডেপুটী বাবুকে অসময়ে ঘুমাইতে দেখিয়া ঘরে ঢুকিয়াও সে ফিরিয়া যাইতেছিল এমন সময় পদশব্দ কানে যাইতেই চোখ বুজিয়াই প্রতুলচন্দ্র বলিলেন—"কে ও রামলাল? ডাক এসেছে বুঝি?"

রামলাল—"জী হুজুর! খবরকা কাগজ, আউর দুনো চিঠি ভি হায়।"

চিঠির কথা শুনিয়াই প্রতুলচন্দ্র চোখ চাহিয়া হাত বাড়াইলেন। রামলাল চিঠি দুখানা হাতে দিয়া খবরের কাগজের মোড়কটা তাকিয়ার একপাশে রাখিয়া দিল।

খাম দুইখানি হাতে লইয়াই প্রতুলচন্দ্র এক খানার হাতের লেখা দেখিয়াই বুঝিলেন যে উহা নীরোদবাসিনীর চিঠি কিন্তু অপরখানা কাহার হস্তাক্ষর দেখিয়া তাহা চিনিতে পারিলেন না। তখন খামের উপর ডাক ঘরের ছাপ দেখিয়া বুঝিলেন উহা 'মুন্সিগঞ্জ—ঢাকা' হইতে আসিয়াছে। দেখিয়াই প্রতুলচন্দ্রের হাতখানা কাঁপিয়া উঠিল এবং

চিঠিখানা হাত হইতে পড়িয়া গেল। রামলাল তাড়াতাড়ি সেখানা কুড়াইয়া বাবুর হাতে দিতে গেল। কিন্তু তিনি উহা আর হাতে লইলেন না—কেবল চোখে ইঙ্গিত করিয়া তথায় রাখিয়া দিতে বলিলেন। রামলাল তখন চিঠিখানা খবরের কাগজের মোড়কটীর পাশে রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রতুলচন্দ্র তখন নীরোদবাসিনীর চিঠিখানা খুলিতে গিয়াও পরে না খুলিয়াই পাশে রাখিয়া দিলেন এবং তাড়াতাড়ি খবরের কাগজের মোড়কটী খুলিয়া ফেলিলেন।

খবরের কাগজখানা খুলিয়া একবার এপিঠ একবার ওপিঠে বড় বড় অক্ষরের শিরোনামগুলি দেখিয়া লইলেন। তৎপর সেখানা রাখিয়া দিয়া আবার একটু চোখ বুজিয়া কি ভাবিলেন এবং ক্ষণিক বাদেই নীরোদবাসিনীর চিঠিখানা হাতে লইলেন। তখন দিবালোক অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া ভৃত্য সেজের ভিতর একটী বাতি জ্বালাইয়া ফরাসের একপাশে রাখিয়া গেল। তখন এ দেশে কেরাসিনের তেমন চলন হয় নাই এবং হারিকেন লণ্ঠন বা ল্যাম্প ইত্যাদিরও আমদানি হয় নাই। সাধারণতঃ রেড়ীর বা নারিকেল তৈলের আলো এবং অবস্থাপন্নদিগের মধ্যে সেজ বা সামাদানে মোম বাতির আলো জ্বলিত। তা ছাড়া কোনও পর্ব্ব বা ক্রিয়াকর্ম্মাদিতে অবস্থানুসারে ঝাড়লণ্ঠন ও দেয়ালগিরী ইত্যাদি আলোকের ব্যবস্থা হইত।

প্রতুলচন্দ্র নীরোদবাসিনীর চিঠির খামখানা ছিঁড়িয়া সবে চিঠিখানা বাহির করিয়াছেন, তখনও চিঠির ভাজটী খোলেন নাই, এমন সময় সদর দরজায় একখানি পাল্কী আসিয়া থামিল। তিনি তখন অবাক হইয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে-রে, কালাচাঁদ ?"

ভৃত্য—"কইতিত পালামনা কত্তা। পেস্কার বাবুর মা ঠাইরাণ হবেক। পাল্কীর সাথেত তানার অম্বিকাঝি বটেক।"

ইহা শুনিয়া প্রতুলচন্দ্রের বিস্ময় আরো বাড়িয়া গেল। পেস্কার বাবুর স্ত্রী কেন যে তাঁর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইবেন—বিশেষতঃ বাড়ীতে যখন কোনও মেয়ে মানুষ নাই—তিনি তাহা ভাবিয়াই পাইলেন না। তিনি তখন ভৃত্যকে পুনরায় ভাল করিয়া দেখিতে বলিয়া চিঠিখানার ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে যাইবেন এমন সময় দরজার বাহিরে শিশুর কলকণ্ঠ শোনা গেল। তখন চিঠিখানা তাড়াতাড়ি পুনরায় খামে পুরিয়া উৎসুক নেত্রে দরজার দিকে চাহিতেই দেখিলেন একজন অবগুণ্ঠিতা যুবতী একটী তিন চারি বৎসর বয়স্ক শিশুর হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিলেন। পশ্চাতে পেস্কার বাবুর ঝি অম্বিকা একটী পুঁটুলি হাতে করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল।

কুলীন-কন্যাদিগের সপত্নী-সম্ভাবনা সদাই বর্ত্তমান। স্বামীগৃহে বাসও কচিৎ কাহারো ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। চিরকাল মাতুলালয়েই তাহাদের প্রায় দিন কাটে এবং স্বামী-সন্দর্শন ভাগ্যে কদাচিৎ সম্ভব হইয়া থাকে। কাজেই প্রথম যখন প্রতুলচন্দ্রের বিধবা-বিবাহের ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং সে সংবাদ ক্রমে গ্রামে আসিয়া পহুছে তখন পুরুষমহলে অনেকটা হৈ চৈ হইলেও মেয়েমহলে তেমন তীব্র অনুভূতি হয় নাই। কারণ সপত্নী-দহনে জর্জ্জরিত এবং সধবা হইয়াও বৈধব্যতুল্য চিরদিন স্বামী-পরিত্যক্ত অবসাদগ্রস্ত মনে সে আন্দোলনের তরঙ্গ শিলা সৈকতে প্রতিহত সাগরোর্ম্মির ন্যায় নিস্ফল হইল। কাজেই সে খবর যখন উমারাণীর কানে পহুছিল তখন তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত হইতে দেখা গেল না। এবং এই কারণেই ভ্রাতৃ-জায়ার সহিত গোপনে পরামর্শ স্থির করিয়া যখন বগুড়াযাত্রা করিলেন

তখনও সপত্নীর কথা ভাবিয়া অভিমানভরে অভিষ্ট কার্য্যে অগ্রসর হইতে বিরত হইলেন না।

অম্বিকা ঝি উমরাণীকে ডেপুটী বাবুর অন্দরে কায়েমী দখলকার সাব্যস্ত করিয়া ভৃত্য কালাচাঁদকে ডাকিয়া বলিল—"ওরে কালা, তোয়ার মা-ঠাইরাইন আইছেন। একডা কোকাও আইছে, তার লাগি মিঠাই আনি দে। আর কত্তা বাবুকে অন্দরে আইতে কইয়া আয়।"

পেস্কার বাবুর ঝির কথায় কালাচাঁদ ছুটিয়া বাড়ীর ভিতরে গেল এবং সম্মুখেই খোকাবাবুকে দেখিতে পাইল। শিশুর অবয়ব দেখিয়া তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে এ ডেপুটী বাবুর ছেলেই বটে। তখন সে ঘরে ঢুকিয়া উমারাণীর পায়ে গড় করিয়াই শিশুকে কোলে তুলিয়া লইল এবং তৎক্ষণাৎ খোকাবাবুকে প্রতুলচন্দ্রের কাছে লইয়া গেল। শিশু অপরিচিতের ক্রোড়ে থতমত খাইয়া আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

পরদিনই শহরময় রাষ্ট্র হইল যে ডেপুটীবাবুর পরিবার আসিয়াছে। সে কথা শুনিয়া সকলেই যেন চিন্তান্বিত হইলেন। সেদিন সন্ধ্যার সময় হেডপণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় দাবার আড্ডাতে বিদ্যাসাগরের অনাচার হইতে দেশ ও সমাজকে কি করিয়া রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হইয়া গেল। সকলের সম্মতিতে হেডপণ্ডিত মহাশয়ের উপরই ইহার প্রতীকারের ভার পড়িল।

ডেপুটীবাবু পরদিন প্রাতে যখন বৈঠকখানায় নথিপত্র খুলিয়া পূর্ব্ব-দিনের কয়েকটী মোকদ্দমার বিচারের রায় লিখিতে উদ্যত এমন সময় হেডপণ্ডিত মহাশয় পেস্কারবাবুকে সঙ্গে লইয়া তথায় হাজির হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই প্রতুলচন্দ্র নথিপত্র আফিসের বাক্সে পুরিয়া অভ্যাগতদিগকে অভিবাদন করিয়া বসাইলেন। তৎপর একথা সেকথার

পর হেডপণ্ডিত মহাশয় উভয় নাসাবিবর নস্য-পরিপূরিত করিয়া শুভাগমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে অনেক কথা কাটাকাটি যুক্তিতর্ক ও আলোচনার পর স্থির হইল যে উপস্থিত ক্ষেত্রে দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণভোজন ও লঘু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইলেই এবং বিধবা-বিবাহের পত্নীর সকল সংস্রব ত্যাগ করিলেই তিনি পুনরায় সমাজে 'চল' হইবেন। কারণ বিদ্যাসাগর মতে বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয় হইলেও হিন্দু বিবাহই বটে, কেননা বিদ্যাসাগর হিন্দুশাস্ত্রের সাহায্য লইয়াই পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সঙ্গে একথাও স্থির হইল যে যে কাগজে বিধবাবিবাহের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে উক্ত পত্রিকাতেই এই প্রায়শ্চিত্তের সংবাদ প্রকাশ করিবার ভার স্বয়ং হেডপণ্ডিত মহাশয় লইলেন।

নীরোদবাসিনীকে বিবাহ করা যেন প্রতুলচন্দ্রের 'সাপের ছুঁচো গেলা' হইয়াছে। সমাজের প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বাহাদুরী লইবার প্রলোভনও ত্যাগ করিতে পারেন না, অথচ সকল প্রকার সামাজিক নির্য্যাতন তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য-পথে অটল থাকিবার মত শক্তিটুকুও নাই। ও দিকে আবার ডেপুটি-গিরির লোভে পড়িয়া বিধবাবিবাহ করিতেও ছাড়িলেন না। নিজের কিছুমাত্র মনের বল নাই একথা কতকটা বুঝিতে পারিয়াই কৃষ্ণনাথ বাবুকে দলে টানিয়া তাল সামলাইবার চেষ্টায় ছিলেন এবং তিনি কাছে থাকিলে এত দিনে হয়ত নীরোদবাসিনীকে লইয়া ঘরসংসার ও করিতে পারিতেন কিন্তু কৃষ্ণনাথ বাবু স্থানান্তরে যাওয়ায় প্রতুল যেন অকূলে ভাসিলেন। নিজকে যখন নিতান্তই অসহায় মনে করিয়া সন্তরণ-অনভিজ্ঞ জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় হাবুডুবু খাইতেছিলেন ঠিক সেই সময়ে সসন্তান উমারাণী মূর্ত্তিমতী গৃহিণীরূপে আবির্ভূতা হইলেন।

প্রতুলচন্দ্র তখন নির্ব্বিচারে তাঁহাকেই ভেলারূপে অবলম্বন করিলেন। নীরোদবাসিনীর কথা ভাবিবারও আর তাঁহার অবসর রহিল না।

যুবক প্রতুলচন্দ্রের সহিত যখন প্রথম রণবীর শর্ম্মার আলাপপরিচয় হয় এবং পরে তাঁহার ভাগিনেয়ীকে উক্ত যুবকের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেন তখনও কেহ জানিতে পারে নাই যে সে যুবক বিবাহিত ছিল। কুলীন ব্রাহ্মণের বহুবিবাহ সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে, ইহাতে বিস্ময় বা নূতনত্বের কোন কারণ নাই ভাবিয়া যুবক নিজেও সে বিষয়ে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই এবং অপর কেহ তাঁহাকে সে কথা তখন জিজ্ঞাসাও করে নাই। কাজেই সে সময়ে উহা সকলের অজ্ঞাতই রহিয়া গেল।

উক্ত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে একদিন সন্ধ্যার সময় রণবীর শর্ম্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে গিয়া দেখেন তিনি বারান্দায় একাকী বসিয়া আছেন, তাঁহার হাতে একখানা 'সমাচার পত্রিকা'। তাঁহাকে দেখিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"ওহে শর্ম্মা, আজকার সমাচার পত্রিকা খানা পড়েছ ?" এই বলিয়াই তিনি হাতের কাগজ খানা রণবীর বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন—"বগুড়ার হেডপণ্ডিতের চিঠি খানা একবার পড়ে দেখ।"

রণবীর—"কেন, নূতন বিয়ের কিছু খবর আছে নাকি ?"

বিদ্যাসাগর—"পড়লেই সব বুঝতে পারবে। কত লোকই যে আমার সঙ্গে প্রতারণা কল্লে তার সীমা নেই। এ দেশের মাটিরই কি গুণ !!"

রণবীর তখন কাগজ খানি হাতে লইলেন এবং সে চিঠিখানা পড়িয়া একবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন ! রোষে, ক্ষোভে ও ঘৃণায় তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না।

বাড়ীতে ফিরিয়াও রণবীর কিছুতেই মনে স্বস্তি বোধ করিতে পারিলেন না। নীরোদবাসিনীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এবং তাহাকে কেন এমন অপাত্রে দান করিলেন এই চিন্তায় তাঁহার অন্তর অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিল। মনের উত্তেজনায় সে রাত্রিতে তাঁহার আর বিন্দুমাত্র নিদ্রা হইল না। প্রতুলচন্দ্র এমন প্রতারক তাহা ত আগে স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। হায়, তাঁহার এমনি মনের ভ্রম যে নীরোদবাসিনীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে একবার জিজ্ঞাসাও করা হইল না বা কোনও সংবাদও লওয়া হইল না যুবক বিবাহিত কি না? কারণ কলীনদিগের এমন হইয়াই থাকে সে সম্ভবনাও অন্ততঃ তাঁহার মনে একবার উদয় হওয়া উচিত ছিল। এইরূপ নানা চিন্তায় তাঁহার মন সারা রাত্রি তোলপাড় হইতে লাগিল।

এদিকে ডাক্তার প্রাণতোষের নামেও কে যেন সেই তারিখের একখানা সমাচার পত্রিকা উল্লিখিত অংশে লাল কালীর দাগ দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। নীরোদবাসিনী পূর্ব্বে নিয়মমত প্রতুলচন্দ্রের চিঠি পাইতেন। কিন্তু তাহার শেষ চিঠি যেদিন প্রতুলচন্দ্রের হাতে পড়ে সেই দিনই যাহা ঘটিয়াছে পাঠকের তাহা জানিতে বাকী নাই। এপর্য্যন্ত সে চিঠির কোনও জবাব না পাইয়া নীরোদবাসিনীর মন নানা চিন্তায় বিশেষ উৎকণ্ঠিত আছে। তিনি প্রতিদিন ডাকের অপেক্ষায় উৎগ্রীব হইয়া থাকেন। প্রাণতোষ বাবু রোগী দেখিতে বাহির হইবার পর সাধারণতঃ ডাকপিয়ন আসিয়া থাকে এবং ভগীরথ ডাকের চিঠিপত্র ডাক্তার বাবুর টেবিলে চাপা দিয়া রাখে। এ কয়দিন ডাকপিয়ন আসিবার সাড়া পাইলেই নীরোদবাসিনী, নিজে আসিয়া ভগীরথের হাত হইতে চিঠিগুলি দেখিয়া যাইতেন। ভগীরথও বুঝিতে

পারিয়া দিদিমণিকে না দেখাইয়া ডাকের চিঠি বাবুর টেবিলে রাখিয়া দিত না। আজও তেমনি ডাকের চিঠি দেখিতে নীরোদবাসিনী নীচে গিয়া দেখিলেন চিঠির পরিবর্ত্তে একখানি বাঙ্গালা খবরের কাগজের মোড়ক আসিয়াছে। উহা হাতে লইয়া খুলিবেন কি না ইতস্ততঃ করিতেছেন ঠিক সেই সময়ে মাতুল রণবীর আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

মাতুলকে দেখিয়াই নীরোদবাসিনী চমকিয়া উঠিলেন। এক রাত্রিতেই তাঁহার চেহারার এমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে যেন কত কালের রোগী! তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই নীরোদবাসিনী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মামা, আপনার এমন অসুখ করেছে আমরা ত একটুও শুনিনি!"

রণবীর—"না মা, অসুখ করবে কেন? কে বল্লে তোমায় আমার অসুখ করেছিল?"

নীরোদবাসনী—"অসুখ করে নাই? তবে আপনার চেহারা এমন দেখ্‌ছি কেন?"

রণবীর—ওঃ, কাল রাত্তিরে ঘুম হয় নাই বলে বোধহয় এমন দেখাচ্ছে।" এই বলিয়াই তিনি ও প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য বলিলেন —"তোমার হাতে ওটা কি কাগজ, নীরু?"

নীরোদবাসিনী—"কি জানি, আজ ডাকে এল দেখ্‌তে পাচ্ছি। এখনও খুলে দেখিনি।"

রণবীর নীরোদবাসিনীর হাত হইতে কাগজখানা হাতে লইয়াই বুঝিলেন উহা 'সমাচার পত্রিকা' এবং এখানে যে অভিপ্রায়ে উহা প্রেরিত হইয়াছে তাহাও তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি তখন কাগজখানা হাতে করিয়াই বলিলেন—"চল মা, উপরে যাই। তোমার

মা এতক্ষণে গঙ্গা থেকে ফিরেছেন নিশ্চয়।" এই বলিয়াই ভগিনীর উদ্দেশে উপরে গেলেন।

আজ একাদশী, তাই রান্নার তাড়া নাই বলিয়া তেতলার ঘরে ক্ষীরোদবাসিনী গৃহে ভাবীশিশুর আগমন সম্ভাবনায় কতগুলি কাঁথা শিলাই করিতে বসিয়াছেন। পাশে বড় নাতিনী ভামিনী পুতুল খেলিতেছে এবং ঠাকুরমাকে তাহার ঘরকন্নার সকল সংবাদ দিতেছে। এবার বেনেপুতুলের বিয়ে দিতে কত দান-সামগ্রী লাগিবে, নূতন বেয়ানকে কি করিয়া খুসী করিতে হইবে ইত্যাদি কত গুরুতর কাজের কথাই হইতেছে! ঠাকুরমাকে প্রত্যেক কথার জবাব না দিলে নিস্তার নাই। এমন সময় নীরোদবাসিনী আসিয়া মাকে মাতুলের আগমন সংবাদ দিলেন। অসময়ে দাদার আগমনে ক্ষীরোদবাসিনী কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন—"দাদা হঠাৎ এ সময়ে এলেন যে? খবর ভালত?"

নীরোদবাসিনী—"কিছুত বলেন নি। তবে তাঁর চেহারাটা বড্ডই খারাপ দেখাচ্ছে। অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন ত কিছুই হয় নি।"

মেয়ের কথায় ব্যস্ত হইয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিলেন—"মা নীরু, এই কাঁথাখানা সবে ধরেছি, একটা ধার মাত্র সেলাই হয়েছে; অমনি রেখে গেলে কাপড়ের ভাঁজগুলো হয়ত জড়িয়ে যাবে। এইনে মা, সূচ সুতোটা, তুই বাকী তিনটা ধার শুধু জুড়ে রাখ। আমি এসে আর সব করবো এখন। ভামিনীও তোর কাছে বসে খেলুক। আমি এখনই যাই, দাদার কথা শুনে আমার বুকটা যেন কেমন দুর্ দুর্ করছে। ঠাকুর না করুন, কোনও অশুভ কিছু না হলেই বাঁচি।" এই বলিয়াই তিনি দোতলার ঘরে নামিয়া গেলেন।

দাদাকে দেখিয়া ভগিনীও চমকিয়া উঠিলেন। এমন চেহারা ত

তাঁহার কখনও দেখেন নাই! তাই ব্যস্তভাবে কাছে গিয়াই বলিলেন—"দাদা, ও কি? কি হয়েছে?"

রণবীর ম্লান হাসিমুখে বলিলেন—"না না, হবে আবার কি? কাল রেতে একটুও ঘুমুতে পারিনি, তাই অমন দেখতে হয়েছে। কিছু হয় নি ত?" এই বলিয়াই ভগিনীকে কাছে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া হাতের কাগজখানা খুলিয়া লাল দাগ দেওয়া অংশটা পড়িতে বলিলেন।

ক্ষীরোদবাসিনী কাগজ খানায় চোখ বুলাইবার পর তাঁহার গা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া চোখ ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল, কিছুই আর পড়িতে পারিলেন না। মাথার ভিতর কেমন যেন সব ওলটপালট হইয়া আসিল, কিছু ধারণা করিবার শক্তিই তখন রহিল না। খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকার পর বলিলেন—"দাদা, আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, কি ব্যাপার?"

রণবীর তখন তাঁহার নিজের অবিবেচনা এবং ত্রুটীর জন্য পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং ভগিনীকে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন। কারণ তিনি অধীর হইলে এ আঘাতে নীরোদবাসিনীর যখন বক্ষ বিদীর্ণ হইবে তখন তাহাকে কে সামলাইবে? হায়, বিধিলিপি বোঝা ভার! কোন্ কর্ম্মফলে আজ নিতান্ত নিরপরাধ বালিকার এই মর্ম্মবিদারক আঘাতের ব্যবস্থা হইল?

পনর

কলিকাতায় আগমন

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনা সমূহের প্রায় পনর বৎসর পর এক দিন অপরাহ্নে গোয়ালন্দ ষ্টীমার-ঘাটের বামদিকে একখানি ভাওলিয়া ও তাহার পশ্চাতে একখানা পান্সী নৌকা আসিয়া ভিড়িল। ষ্টীমার ভিড়িবার নির্দ্দিষ্ট কোনও বাঁধা ঘাট নাই—পদ্মার তীরে যেখানে রেলের লাইন আসিয়া শেষ হইয়াছে তাহার ঠিক সম্মুখেই অদূরে একখানা 'ফ্ল্যাট' তীরসংলগ্ন হইয়া বাঁধা রহিয়াছে; উহারই অপর পার্শ্বে ষ্টীমার আসিয়া ভিড়ে এবং এই ফ্ল্যাটের ভিতরেই টিকিট ঘর, আফিস ইত্যাদি রহিয়াছে। ফ্ল্যাটের দক্ষিণে বামে বহুদূর বিস্তৃত পদ্মাবক্ষ ক্ষুদ্রবৃহৎ নানা প্রকার অসংখ্য জলযানে পূর্ণ। যে স্থানে নৌকা দুইখানি আসিয়া তীরে লাগিল তথা হইতে জলপথে রেলবর্ত্মের সন্নিকটে আসিবার উপায় নাই এবং স্থলপথেও উচ্চনীচ তীরভূমি অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। নৌকার আরোহীদিগের মধ্যে প্রথম নৌকায় একজন যুবক ও তাঁহার ভৃত্য এবং অপর নৌকাখানিতে রন্ধনের সাজসরঞ্জাম ও একজন পাচক ব্রাহ্মণ এবং অপর তিনজন লোক রহিয়াছে।

সন্ধ্যার পর যখন পদ্মাবক্ষ বিবিধ জলযানের দীপালোকে সজ্জিত হইল তখন বীচিবিক্ষোভিত খর-স্রোতে সে আলোক প্রতিফলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ভাওলিয়ার আরোহী যুবক সে সময়ে ভৃত্যকে বলিলেন—"বাঞ্ছারাম, নৌকার ছাদে আমার বিছানা করিয়া দে আর গোমস্তা বাবুকে ডাকিয়া দে।"

অপর নৌকা হইতে গোমস্তা আসিলে বাবু বলিলেন—"বনমালী, রাত্রি দশটায় গাড়ী। আজই আমি কলিকাতায় রওয়ানা হইব, তোমরা সব প্রস্তুত হও। আর তুমি এখনই গিয়া একখান দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী ঠিক করিয়া আইস। তোমাদের জন্যও চারখান তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া মালগুলি লগেজে দিবার ব্যবস্থা করিয়া ফেল। টিকিট বাবুকে কিছু বক্‌সিস্ দিলে তিনিই মালপত্র সব তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।"

বনমালী গোমস্তা "যে আজ্ঞা, কর্ত্তা" বলিয়া প্রস্থান করিল।

পাঠকের বোধহয় বুঝিতে বাকী নাই যে ইনিই আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বল্লভপুরের জমিদার সেই জীবনবল্লভ বাবু কলিকাতায় পড়িতে যাইতেছেন।

পরদিন ভোরে যখন শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল তখন নিম্নে প্রকাণ্ড প্ল্যাটফরম্ এবং উর্দ্ধে আকাশব্যাপী আচ্ছাদন দেখিয়া বাঞ্ছারাম বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতে লাগিল! সে বাবুর সঙ্গে অনেকবার ঢাকায় গিয়াছে কিন্তু রাজধানী কলিকাতায় তাহার এই প্রথম পদার্পণ। কলিকাতায় পথ হারাইবার বিশেষ ভয় আছে সে কথা বলিয়া বনমালী দাস তাহাকে পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া দিয়াছিল।

গাড়ী হইতে নামিয়াই ষ্টেশনে লোকারণ্য দেখিয়া এবং চারিদিকে হৈ চৈ শুনিয়া সে সর্ব্বাগ্রে পশ্চাত হইতে গোমস্তা বাবুর কাছাটী সজোরে আঁকড়াইয়া ধরিল। পিছন হইতে হঠাৎ টান পড়িতেই গোমস্তার গা কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিল এইবারে বুঝি তাহাকে গাঁটকাটার হাতে পড়িতে হইল! বেটারা তাহার কোমরে জড়ান টাকা-ভরা গেঁজিয়াটির সন্ধান এরই মধ্যে কি করিয়া পাইল—এই ভাবিয়া সে

তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে বাবুর গাড়ীর দিকে ছুটিতে চেষ্টা করিল—ভয়ে ভ্যাবা-চ্যাকা খাইয়া বাঙ্গারামের কথা একবারে ভুলিয়া গেল। কিন্তু ছুটিতে গেলেও গাঁটকাটার হাত হইতে রক্ষা নাই—লোকটা যে তাহাকে পিছন হইতে ধরিয়াই আছে!

এদিকে গোমস্তাবাবুকে ছুটিতে দেখিয়া ঠাকুর এবং অপর ভৃত্যটিও হাতধরাধরি করিয়া তাহাদের পিছনে ছুটিতে গেল। তখন ভিড়ের জন্য অধিক অগ্রসর হইতেও পারিতেছিল না। একটু অগ্রসর হওয়ার পরই বাঙ্গারাম একটা ট্রাঙ্কের গায়ে হুঁচোট খাইয়া পড়িয়া গেল। তখন পিছন হইতে হঠাৎ কাছায় টান লাগিয়া সঙ্গে সঙ্গে গোমস্তাকেও চীৎপাত হইয়া বাঙ্গারামের ঘাড়ের উপরই পড়িতে হইল। জীবন-বল্লভ বাবু গাড়ী হইতে নামিয়াই ভৃত্যদের খোঁজে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর দিকে আসিতে ছিলেন। এমন সময় পথে গোমস্তাকে তদবস্থায় দেখিয়া তাঁহারও হাস্য সম্বরণ করা দায় হইল।

তৎপর বনমালী প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত অপ্রতিভ হইল এবং বাঙ্গারামকে তিরস্কার করিতে লাগিল। এতবার সে কলিকাতায় আসিয়াছে কেহ কখনও তাহাকে ঠকাইতে পারে নাই। এবার কি একটা 'অযাত্রা'কে সঙ্গে আনিয়া এমন নাকাল হইতে হইল এবং বাবুর কাছেও কেমন লজ্জা পাইতে হইল। এবার সে প্রতিজ্ঞা করিল আর বাঙ্গারামকে কখনও কোনও উপদেশ দিতে যাইবে না—লোকের ভাল করিতে গেলে এমনি মন্দ হয়! বাঙ্গারামের হাঁটুতে ট্রাঙ্কের কোণটা লাগিয়া খানিকটা কাটিয়া গিয়াছিল কিন্তু সে বিষয়ে তখন আর সে কোনও উচ্চবাচ্য করিতে সাহস করিল না।

ইহার পর একখানা ফিটন গাড়ীতে বাবু এবং গোমস্তা আর পরেপরে দুইখানা পাল্কী গাড়ীতে জিনিষপত্র বোঝাই দিয়া ঠাকুর ও ভৃত্যদ্বয়—

এই ভাবে তিনখানা গাড়ী আসিয়া কাঁসারীপাড়ার মোড়ে দাঁড়াইল। গাড়ীতে বসিয়া বাঞ্ছারাম কতকটা হাঁটুর বেদনায় এবং কতকটা কলিকাতার অভিনব দৃশ্যে অভিভূত হইয়া নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে এক দৃষ্টে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন বৈদ্যুতিক ট্রাম ছিল না। শিয়ালদহ, বহুবাজার ও ওয়েলেস্‌লী প্রভৃতিতে এক ঘোড়ার এবং অপর সকল রাস্তায় দুই ঘোড়ার ট্রামগাড়ী চলিত। রেলের উপর দিয়া এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব গাড়ী ঘোড়ায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া একবারে তাক লাগিয়া গেল!

কলিকাতায় আসিয়া জীবনবল্লভ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। প্রথমবার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার চাপ একবারেই থাকে না। প্রতিদিন একঘণ্টা কি দুইঘণ্টা কলেজ হইয়াই ছুটী। যে সকল ছাত্র কলিকাতায় নূতন আইসে তাহাদের পক্ষে এই ছুটীটা বড়ই কাজে লাগে। আজ যাদুঘর, কাল চিড়িয়াখানা, পরশু কোম্পানীর বাগান, তার পর একদিন পরেশনাথের মন্দির, একদিন হাবড়া পোল, একদিন হয়ত গড়ের মাঠে কেল্লা, আবার একদিন বা ইডেন-উদ্যান এইরূপ নিত্য নূতন দেখিবার জিনিষ কত আছে তার সীমা নাই। তারপর আজ এখানে বক্তৃতা, কাল ওখানে সভাসমিতি, পরশু থিয়েটার, এই-রূপ কত কি আকর্ষণের আয়োজন রহিয়াছে। কলিকাতায় আসিয়াই ছেলেরা বেশ ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে এবং নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া জ্ঞান সঞ্চয়েরও সুযোগ পায়।

জীবনবল্লভ যখন কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিলেন তখন ডাক্তার প্রাণতোষের প্রৌঢ়াবস্থা। তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা। ভামিনী, পুষ্পময়ী ও চিন্ময়ী এই তিন কন্যাই তখন বেথুন কলেজ ও স্কুলে পড়িতেছেন। ভামিনী প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া কলেজে

অধ্যয়ন করিতেছেন এবং পুষ্পময়ী বেথুন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে আর চিন্ময়ী পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ করিতেছেন। পুত্রদ্বয় ভবতোষ এবং চিত্ত-তোষ যথাক্রমে পটলডাঙ্গার সিটী স্কুলের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র।

ঠিক এই সময়েই কৃষ্ণনাথ রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারও পটলডাঙ্গার ঘোষালদের বাড়ীর পশ্চাতে একটী বাটী ক্রয় করিয়া স্থায়ী ভাবে কলিকাতাতেই বাস করিতেছিলেন। ৺কৃষ্ণনাথ রায়ের তিন পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রদিগের নাম প্রীতিনাথ, ক্ষীতিনাথ ও বীথিনাথ এবং কন্যাদিগের নাম পূর্ব্বে ছিল কুঞ্জমণি, প্রমাদিনী ও ক্ষান্তমণি; কিন্তু কলিকাতার ভব্য সমাজে এ সকল পুরাতন নাম নিতান্ত অশোভন বিধায় তাঁহাদের পূর্ব্ব নাম বদল করিয়া বেথুন স্কুলে নূতন নামকরণ হইয়াছে—কুন্তলা, প্রমীলা ও ক্ষেমলা।

কুন্তলা পুষ্পময়ীর সহিত তৃতীয় শ্রেণীতে, প্রমীলা চতুর্থ শ্রেণীতে এবং ক্ষেমলা চিন্ময়ীর সহিত পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ করিতেছেন। আবার প্রাণ-তোষ বাবুর পুত্র ভবতোষও প্রীতিনাথের সহপাঠী। এই সূত্রেই কাঁসারীপাড়ার ডাক্তার পরিবারের সহিত পটলডাঙ্গার রায় পরিবারের পরিচয় এবং অবশেষে যাতায়াত ও ক্রমে আত্মীয়তার সূত্রপাত হইয়াছিল।

এই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের একটী সহপাঠীর সহিত জীবন-বল্লভেরও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। উক্ত যুবকের নাম ছিল সদানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার দেশ ছিল পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর। পরে জানা গেল এই যুবকই আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ডেপুটি প্রতুলচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়ের প্রথম পক্ষের সন্তান। দ্বিতীয় পক্ষে তিনি ডাক্তার প্রাণ-তোষের সদ্য-বিধবা ভগিনী নীরোদবাসিনীকে বিদ্যাসাগরমতে বিবাহ করেন।

গোমস্তা জীবনবল্লভ বাবুর জন্য যে বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিল তাহা কাঁসারীপাড়ার মোড় হইতে কয়েক পা গেলেই বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীটের কোণে। যাতায়াতের পথে জীবনবল্লভ বাবুকে সর্ব্বদাই ডাক্তার প্রাণতোষ মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীর পাশ দিয়াই যাইতে হয়। তা ছাড়া চিকিৎসা উপলক্ষেও প্রাণতোষ কয়েক বার জীবনবল্লভ বাবুর বাড়ী আহুত হইয়াছিলেন। জীবনবল্লভের অমায়িক ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া ডাক্তার বাবুও তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যান এবং ক্রমে উভয়ের মধ্যে এতটা ঘনিষ্টতা জন্মে যে অবশেষে বাড়ীর মেয়েদিগের সহিতও আলাপ পরিচয় হয়।

ষোল

পত্নী-বিয়োগ

আমরা যেদিন বল্লভপুর হইতে শেষ বিদায় লইয়াছি তাহার পর পাঁচ বৎসর অতিক্রম হইতে চলিল। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে বল্লভপুরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটে নাই।

যে উষাবালার জন্মদিনে আমরা একদিন বল্লভপুরে আনন্দউৎসবের ঘটা দেখিয়াছি সেই কুসুমকলি বালিকা এই পাঁচ বৎসরে পা দিয়াছে। জীবনবল্লভ বাবুরও বি-এ, পাশের খবর আসিয়াছে, তাই আজ জ্যেষ্ঠ প্রাণবল্লভের আনন্দ ধরে না। ময়মনসিংহের জমিদারদিগের মধ্যে এই সর্ব্ব প্রথম গ্রেজুয়েট! স্কুলে পড়াই যাঁহারা মানহানিকর মনে করেন তাঁহাদেরই একজন আজ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী!! আজ সকলের মনেই এক অভিনব আনন্দের উচ্ছ্বাস বহিয়া যাইতেছে। প্রাণবল্লভের উচ্ছ্বসিত আনন্দবেগ আজ বল্লভপুরের জমিদারদিগের বহির্ব্বাটীতে উৎসবের ধারায় প্রবাহিত। কিন্তু অন্তঃপুরে যিনি আজ স্বামীগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইবার সম্পূর্ণ অধিকারিণী তিনিই কেবল সে আনন্দোৎসবে যোগদানে বঞ্চিতা!

উর্ম্মিলা দেবী ছয়মাস কাল ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছেন। ইহার উপর তাঁহার সন্তান-সম্ভাবনা। আজ প্রায় এক মাস হইতে চলিল তিনি একেবারে শয্যাগতা অবস্থায় আছেন। মুখ একেবারে পাণ্ডুবর্ণ, দেহ রক্তহীন এবং হাত পা ও চোখে মুখে শোথের আবির্ভাব-

হইয়াছে। সদর হইতে ডাক্তার সাহেবকে আনা হইয়াছিল। তিনি অবিলম্বে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছেন।

জ্যেষ্ঠ প্রাণবল্লভ ভ্রাতৃজায়ার অবস্থা ভাবিয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি গোমস্তাকে ডাকিয়া ত্বরায় তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে আদেশ দিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই সকল আয়োজন হইয়া গেল এবং একদিন মধ্যাহ্নে তিনখানি নৌকা বল্লভপুর হইতে গোয়ালন্দ অভিমুখে যাত্রা করিল। উর্ম্মিলা-দেবীর সঙ্গে গেলেন তাঁহার দূর সম্পর্কীয় এক বিধবা পিসী এবং বাড়ীর পুরাতন দাসী দিগম্বরী। বালিকা উষাবালাও অবশ্য সঙ্গে ছিল। তাছাড়া জীবনবল্লভ বাবু, ভৃত্য বাঞ্চারাম, গোমস্তা, পাচক ও অপর ভৃত্যদ্বয়কেও সঙ্গে লইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জীবনবল্লভ বাবু কলিকাতায় যে বাড়ীতে থাকেন তাহা ডাক্তার প্রাণতোষের বাড়ী হইতে প্রায় রাস্তার এপার ওপার বলিলেও চলে। যে দিন উর্ম্মিলা দেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইল সেই দিনই নীরোদবাসিনী আসিয়া তাঁহার সেবার ভার লইলেন।

যেদিন প্রতুলচন্দ্রের পূর্ব্ব স্ত্রীর সহিত পুনর্ম্মিলন এবং প্রায়শ্চিত্তের সংবাদ নীরোদবাসিনীর কর্ণে পঁহুছিল সেইদিন হইতে তাঁহার জীবন-স্রোত এক নূতন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহার স্বভাব-শান্ত আঘাত-সহিষ্ণু মূক প্রকৃতি সে প্রচণ্ড আঘাত নীরবেই বহন করিয়াছিল। তিনি এখন সেবাধর্ম্মকেই জীবনের সার করিয়া মাতার ন্যায় পরহিতে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। তাই প্রথম দিনই উর্ম্মিলা দেবীকে ভগিনীর ন্যায় স্বীয় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া চিরপরিচিতের মত গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সকল সঙ্কোচ অপসরণ করিতেও সমর্থ হইলেন।

ক্রমে এমন হইল যে উর্ম্মিলা দেবার আর 'নীরুদি'কে না হইলে এক দণ্ডও চলেনা এবং ঊষাবালাও কিছুতেই মাসীমার আঁচল ছাড়া হয় না।

কলিকাতায় আসিবার পর প্রথম কয়েকদিন উর্ম্মিলা দেবীর রোগের উপশম হইতে দেখা গেল। কিন্তু পরে রোগীর অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতে চলিল। রাজধানীর বড় বড় নামজাদা ডাক্তার কবিরাজ সকলকেই দেখান হইল কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। ইহার পর যখন প্রসব-কাল আসন্ন হইয়া আসিল তখন অবস্থা বড়ই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। নীরোদবাসিনী তখন আর একাকী মাতা ও কন্যা উভয়কে দেখিয়া উঠিতে পারেন না। কাজেই ঊষাবালাকে তখন স্থানান্তরে রাখাই স্থির হইল এবং নীরোদ-বাসিনী তাহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানে তাহাকে ডাক্তার প্রাণতোষের কন্যাগণ ভুলাইয়া রাখিবার আয়োজন করিলেন। বিশেষভাবে পুষ্পময়ীর আদরযত্নে ও ক্রীড়াকৌশলে ঊষাবালা তাঁহার নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল।

মেয়েরা স্কুলে চলিয়া গেলে বালিকার মন মা ও নীরুমাসীর জন্য চঞ্চল হইয়া পড়িত। তবে পুষ্পময়ীর সঙ্গেই সে প্রতিদিন খাইতে বসিত, তাই তাহারা স্কুলে চলিয়া গেলে ক্ষীরোদবাসিনী দেবী তাহাকে জুজুবুড়ীর গল্প বলিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিতেন। নীরদবাসিনী দিনে এক বার এ বাড়ীতে খাইতে আসিতেন। প্রায় সেই সময়েই তাহার ঘুম ভাঙ্গিলে নীরুমাসীকে দেখিতে পাইয়া অনেকটা শান্ত হইত।

একদিন ঘুম হইতে উঠিয়াই শুনিল তাহার একটি ভাই হইয়াছে। শুনিয়া দেখিবার জন্য বালিকা অস্থির হইয়া পড়িল। বিকাল বেলায় যখন নীরুমাসীর সঙ্গে মায়ের কাছে গেল তখন দেখিল যে বিছানার

একপাশে কাপড় জড়ান একটি ছোট শিশু! দেখিয়াই সে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে চুমা খাইল। মা অসাড় হইয়া পড়িয়া আছেন, তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। তখন নীরুমাসীর কাছে আসিয়া ও কি করিয়া কোথা হইতে আসিল, কে তাহাকে এখানে রাখিয়া গেল ইত্যাদি প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

নীরুমাসী বলিলেন—"খুকুমণি, ভগবান তোমার জন্য এই ভাইটিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কেমন মজাকরে তোমরা দুজনে খেলা করবে।"

শুনিয়া বালিকা অবাক হইয়া গেল! তারপর মনে মনে ভাবিতে লাগিল—বাঃ রে! ভগবান একলা তাকে কি করিয়া পাঠাইলেন? নিশ্চয়ই তা হইলে কোন পরী তাহাকে এখানে দিয়া গিয়াছে। হায়! সে সময়ে যদি সে এখানে থকিত তাহা হইলে ত সবই সে দেখিতে পাইত। তখন কে কে এখানে ছিল? মা আর নীরুমাসী ছাড়া ত কেউ ছিল না। তাঁহাদের কি মজা! তাঁহারা ত নিশ্চয়ই পরীকে দেখিয়াছেন। এইরূপ নানা কথা ভাবিয়া তখন তাহার মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। কেন সে তখন ঘুমাইয়াছিল, কেন তাহাকে কেউ জাগাইয়া দিল না? সে মনে মনে স্থির করিল যে আর কখনও সে এমন করিয়া ঘুমাইয়া থাকিবেনা।

পর দিন নীরোদবাসিনী যখন খাইতে আসিলেন তখন ঊষাবালা আবার ভাইকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তিনি তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন যে তাহার মার শরীর বড়ই খারাপ, আর ভাইটিও এখন ঘুমাইতেছে, কাজেই এখন সেখানে যাইতে নাই। মা ভাল থাকিলে কাল নিশ্চয়ই তাহাকে ভাইয়ের কাছে লইয়া যাইবেন এই আশ্বাস দিয়া তবে তাহাকে শান্ত করিতে পারিলেন।

এদিকে উর্ম্মিলা দেবীর অবস্থা ক্রমেই আরও খারাপ হইতে চলিল

এবং নবজাত শিশুর অবস্থাও এত খারাপ যে আর এক দিনেরও ভরসা নাই! যত দিন যাইতে লাগিল রোগের বেগ প্রশমিত না হইয়া কেবল বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। এদিকে নীরোদবাসিনীর অক্লান্ত সেবারও আর বিরাম নাই। শেষে এমন হইল যে তাঁহার আর স্নানাহারেরও অবসর রহিল না। রোগীকে পাঁচমিনিটের জন্যও আর কাহারো কাছে রাখিয়া তিনি কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না।

তারপর একদিন ঊষাবালা জানিল যে তাহার ভাইটি আর নাই! তাইত, নাই কেন? কোথায় গেল? কে তাহাকে নিয়া গেল? আর কি সে আসিবেনা? এই সকল প্রশ্ন তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল। পরে শুনিল যে ভগবান তাকে যেমন এক পরীকে দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তেমনই আবার এক পরীকে দিয়া লইয়া গেলেন। শুনিয়া বালিকা আবার ভাবিতে লাগিল—হায়, হায়! এ বারও তাহার পরী দেখা হইলনা! সে যদি তখন সেখানে থাকিত তবে হয়ত পরীরা তাহাকেও ডাকিয়া লইত। তারপর ভাবিল ভগবান যখন নিজে ইচ্ছা করিয়া তাহার ভাইটিকে লইয়া গেলেন তখন সে আর কি করিবে? তবে এ বারেও তাহার পরী দেখা হইল না বলিয়া বালিকার মনে বড়ই আক্ষেপ হইতে লাগিল।

ইহার পর কয়দিন আর নীরোদবাসিনী খাইতেও এবাড়ীতে আসিলেন না। মা ও নীরুমাসী কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বালিকা একবারে অস্থির হইয়া পড়িল! খেলাতেও তাহার আর মন বসেনা। পুষ্পময়ী বহু চেষ্টা করিয়াও আর ভুলাইয়া রাখিতে পারেন না। রাত্রিতে খাইবার সময় তেমন খাওয়াও হইলনা। যখন ঘুমাইয়া গেল তখন যেন স্বপ্ন দেখিয়া মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠিতে লাগিল।

সে দিন ভোররাত্রিতে কাছেই কোথায় কান্নার শব্দে বালিকার

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তখন ভয়ে পুষ্পময়ীকে জড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া রহিল। তারপর কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহা টেরও পায় নাই। পরে যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন অনেক বেলা হইয়াছে। উঠিয়া দেখিল নীরুমাসীর মার চোখে জল, পুষ্পময়ীরাও সকলে যেন মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছেন। তাহাকে দেখিয়া সকলে আড়ালে গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলাবলি করিতেছেন।

এ সব দেখিয়া বালিকা ভাবিল মার অসুখ কি তবে বেশী হইল? মা হয়ত তাহাকে দেখিতে চাইবেন। না—না—সে আর কিছুতেই এখন এ বাড়ীতে থাকিবেনা। এই ভাবিয়া সে তখন তাহাকে মায়ের কাছে লইয়া যাইবার জন্য পুষ্পময়ীকে বার বার জেদ করিতে লাগিল। কিন্তু পুষ্পময়ীর স্কুলে যাইতে হইবে, তাঁহার সময় কোথায় যে এখন তাহাকে তিনি লইয়া যাইবেন? এইভাবে তখন বালিকাকে প্রবোধ দেওয়া হইল। কাজেই তাহার আর যাওয়া হইল না। তবে কিছুকাল পরই নীরোদবাসীনীর নিকট হইতে খবর আসিল যে তিনি আজ বিকালবেলাই ওবাড়ী হইতে একবারে চলিয়া আসিবেন। একথা শুনিয়া বালিকা ভাবিল তবে তাহার মা নিশ্চয়ই ভাল হইয়াছেন। তা না হইলে নীরুমাসী চলিয়া আসিবেন কেন? তাই তখন সে চুপ করিয়া গেল।

সে দিন খাওয়ার পর অন্য দিনের মত ঘুম পাড়াইবার জন্য ক্ষীরোদ-বাসিনী দেবী তাহাকে নানা কথায় ভুলাইয়া বিছানায় লইয়া গেলেন। বালিকা আর কোনও কথা না বলিয়া চোখ বুজিয়া রহিল। এইভাবে কিছুকাল থাকিবার পর বালিকা ঘুমাইয়াছে ভাবিয়া ক্ষীরোদবাসিনী দেবী নিশ্চিন্ত মনে তেতলার ঘরে চলিয়া গেলেন।

যখন বাড়ীতে সকলের খাওয়াদাওয়া শেষ হইয়াছে এবং সকলে যে

যার ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় উষাবালা চুপি চুপি বিছানা হইতে উঠিয়া একেবারে নীচে নামিয়া গেল। সদর দরজার কাছে আসিয়া দেখিল ভগীরথ দরজার পাশে একটা বেঞ্চির উপর শুইয়া নাক ডাকাইতেছে। বালিকা তখন দরজার সম্মুখে ফুটপাথের কাছে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। রাস্তায় তখন জনপ্রাণী নাই বলিলেও চলে। নীরুমাসী কখন যে আসবেন—সে—ই—ত বিকালে! এত দেরী তখন আর তাহার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না!

সে তখন ফুটপাথে নামিয়া পড়িল। তারপর ভাবিল এই ত রাস্তাটা ঘুরিয়া ও দিকে গেলেই তাহাদের বাড়ী। এ আর কতটুকুই বা পথ? আনায়াসে সে ত এইটুকু একলাই পার হইয়া যাইতে পারে। আর কাপড়চোপড় পরবারই বা দরকার কি? এই ফ্রক গায়ে, চটী পায়েই ত সে একদৌড়ে চলিয়া যাইতে পারে। না—না, আর দেরী নয়! এই ভাবিয়াই এক পা দুই পা করিয়া সে চলিতে লাগিল এবং দুই মিনিটেই তাহাদের বাড়ীর দরজায় গিয়া উপস্থিত হইল।

সেখানে গিয়া দেখিল সদর দরজা খোলাই রহিয়াছে। তখন বাড়ীতে ঢুকিয়া বরাবর সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। বাড়ীতে জন-প্রাণীর শব্দ নাই, যেন খাঁ খাঁ করিতেছে! দোতলায় উঠিয়াই বালিকা একবারে তাহার মায়ের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। দরজা ভেজান ছিল, ঠেলিবা মাত্র খুলিয়া গেল। ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল কোথাও কিছু নাই! খালিঘর পড়িয়া আছে—খাটে বিছানাপত্রও কিছু নাই। কেবল জলের দাগ দেখিয়া বুঝিল এইমাত্র কে যেন সব ধুইয়া দিয়াছে।

খালিখাট দেখিয়া বালিকা কি এক অজ্ঞাত ভয় বা আশঙ্কায় যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল! তাহার বুক তখন দুর্ দুর্ করিতে লাগিল।

এমন সময় কি একটা ঔষধের শিশি হাতে করিয়া নীরোদবাসিনী বারান্দা দিয়া নীচে নামিতে যাইতে ছিলেন। হঠাৎ সেই ঘরের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। অকস্মাৎ উষাবালাকে একাকী ওঘরে দেখিয়া তিনি একটু বিরক্তিভরে বলিলেন—"খুকুমণি!"

বালিকা তখন ঘর হইতে বাহির হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"মা কোথায়?"

নীরোদবাসিনী—"আমি ত আজই বিকালে বাড়ী ফিরে যাব, বলে পাঠিয়েছি। ছি! তোমার কি এইটুকু সবুর সইলনা?"

বালিকা সেকথার কোনও উত্তর না দিয়া পুনরায় ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"মা কোথায় গেল?"

বালিকার ব্যাকুলতা দেখিয়া নীরোদবাসিনীর ভাবান্তর হইল। তিনি তখন স্নেহসিক্ত স্বরে বলিলেন—"খুকুমণি, মা ঈশ্বরের কাছে গেছেন।"

বালিকা—"ঈশ্বরের পরীরা বুঝি তাকে নিয়া গেল?"

নীরোদবাসিনী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, মা।"

বালিকা—"নিরুমাসী, আপনি তখন সেখানে ছিলেন?"

নীরোদবাসিনী পুনরায় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ মা, ছিলুম বই কি?"

বালিকা—"পরীরা কি মাকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেছে?"

নীরোদবাসিনী—"হ্যাঁ, মা।"

বালিকা—"মা কি আর আমার কাছে আসবেন না?"

নীরোদবাসিনী ক্ষুন্নস্বরে বলিলেন—"না, মা।"

এই কথার পরই বালিকা ছুটিয়া তাহার বাবার ঘরে গেল। সেখানে গিয়া দেখিল তাহার বাবা রাস্তার দিকের জানালা খুলিয়া

একদৃষ্টে শূন্যে আকাশের দিকে তাকাইয়া আছেন। বালিকা যে ঘরে ঢুকিল তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না।

* * * *

সব যখন শেষ হইয়া গেল তখন জীবনবল্লভ কলিকাতার বাস একবারে তুলিয়া দিয়া দেশে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। ঊর্ম্মিলা দেবীর মৃত্যুর পরদিন যখন নীরোদবাসিনী ওবাড়ী হইতে চলিয়া আসেন তখন ঊষাবালাকেও তাঁহার সঙ্গে আনিলেন। মাতৃ-হারা বালিকাকে নীরোদবাসিনী এমন ভাবে আপনার বুকে টানিয়া লইলেন যে যে দিন জীবনবল্লভ তাহাকে দেশে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিলেন সে দিন বালিকা কিছুতেই নীরুমাসীর অঞ্চল ত্যাগ করিলনা। জীবনবল্লভ কত বুঝাইলেন, কত প্রলোভন দেখাইলেন কিন্তু কিছুতেই বালিকার মন টলাইতে পারিলেন না।

সতর

বিলাত-গমন

কলিকাতার বাস উঠাইয়া জীবনবল্লভ দেশে গিয়া রহিলেন বটে, কিন্তু সেখানে তাঁহার কিছুতেই আর মন বসিতে ছিলনা। জ্যেষ্ঠের অকৃত্রিম স্নেহ, শাশুড়ীর অনাবিল আদর, এ সকল কোনও বন্ধনই সে উড়ু উড়ু মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিতেছে না! মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিবার জন্য রাজধানীতে নানা আয়োজন আছে সত্য, কিন্তু দেশে থাকিয়া বৈচিত্র্যহীন নিষ্কর্ম্মা জীবন বহন করা অতিশয় দুরূহ। উচ্চশিক্ষায় যে জ্ঞানপিপাসা উদ্দীপিত হইয়াছে তাহার চরিতার্থতার সুযোগও তথায় সম্ভব নহে। এই সকল ভাবিয়া একদিন জীবনবল্লভ তাঁহার দাদার কাছে বিলাতগমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

জ্যেষ্ঠ প্রাণবল্লভ ভ্রাতৃগত-প্রাণ। তিনি পূর্ব্ব হইতেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে তাঁহার অতি আদরের ছোট ভাইটী পত্নী-বিয়োগের পর হইতে কেমন বিষাদ-গম্ভীর ভাবে দিন কাটায়। সকল বিষয়েই একটা ঔদাসিন্যের ভাব যেন তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে! সেজন্য তিনি মনে মনে বড়ই ক্লিষ্ট হইতেছিলেন, কিন্তু কোনও প্রতি-বিধানের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আজ জীবনবল্লভ আপনা হইতে তাঁহাকে সুদূর প্রবাসে যাওয়ার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে হঠাৎ যেন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল!

এতদিন অনেকেই ভাইকে পুনরায় উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া

তাঁহার মন বাঁধিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ভ্রাতার পত্নীবিয়োগজনিত তীব্র আঘাতের ক্ষত তাজা থাকিতে এরূপ প্রলেপ-প্রয়োগের ব্যবস্থা সমীচীন হইবে না ভাবিয়া সে কথা উত্থাপন করেন নাই। কনিষ্ঠের এ প্রস্তাবে আজ তাঁহার মনে যুগপৎ বহু সমস্যার উদয় হইল এবং নানা চিন্তাতরঙ্গে তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি সহসা সে কথার জবাব দিতে পারিলেন না।

আজকাল সমুদ্র-যাত্রা করিলে যেমন জাতিনাশের তত সম্ভাবনা নাই এবং প্রায়শ্চিত্তেরও অনেকটা প্রয়োজনাভাব, তখনকার দিনে এবিষয়ে সামাজিক নির্য্যাতনের এমন শিথিলতা দৃষ্ট হইত না। বরং 'বঙ্গবাসীর' মারফতে হিন্দুসমাজের পুনরুত্থানের আন্দোলন তখন প্রবল বেগেই বহিতেছিল। এই অবস্থায় ভ্রাতার এ প্রস্তাবে প্রাণবল্লভকে যে কিঞ্চিৎ বিচলিত করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অবশেষে সর্ব্বোপরি ভ্রাতৃস্নেহেরই জয় হইল। তিনি 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' ভাব গ্রহণ করিয়া রহিলেন; নিজে তাঁহার গমনের কোনই আয়োজন করিলেন না।

ইহার কিছুদিন পর জীবনবল্লভ যখন ভিতরে ভিতরে সমস্ত আয়োজন করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন তখন প্রাণবল্লভ এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট নাই জানিয়া তাঁহার উপর কোনও সামাজিক নির্য্যাতনের ব্যবস্থা হইল না। তবে তিনি যে কোন্‌দিন কলিকাতায় গিয়া ভ্রাতাকে জাহাজে তুলিয়া ফিরিয়া আসিলেন সে কথা দেশে সকলের কাছে অজ্ঞাতই রহিয়া গেল।

জীবনবল্লভ যে বার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এ পাশ করিলেন সেইবার তাঁহার সহপাঠী সদানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বি, এ পাশ করেন। সদানন্দ সুপুরুষ, সুবক্তা এবং

তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহারেও সকলে সন্তুষ্ট। সহপাঠীদিগের মধ্যে জীবনবল্লভের সহিতই তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব। পিতা প্রতুলচন্দ্র সেবারে রঙ্গপুরের সিনিয়ার ডেপুটী। পরীক্ষার পর সদানন্দ তাঁহার পিতার কাছেই গিয়াছিলেন। জীবনবল্লভ যেদিন বিলাতযাত্রার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় আসিলেন সেই দিনই সদানন্দকে সে সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার সমুদ্রযাত্রার শুভকামনা করিবার জন্য সে সময়ে সদানন্দকে কলিকাতায় উপস্থিত থাকিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন।

সদানন্দ যে দিন বন্ধুর বিলাতযাত্রার সংবাদ পাইলেন সেই দিন প্রাতে পিতা প্রতুলচন্দ্র পুত্রকে লইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে গেলেন এবং পরীক্ষায় পুত্রের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া সাহেবের সহানুভূতি আকর্ষণের প্রয়াস পাইলেন। অভিপ্রায়, সাহেব যদি সুপারিশ করিয়া সদানন্দকেও একটা ডেপুটিগিরি যোগাড় করিয়া দেন। সাহেব সদানন্দের সহিত আলাপ করিয়া খুসী হইলেন এবং তাঁহাকে বিলাতে গিয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন।

সে দিন সন্ধ্যার পর প্রতুলচন্দ্র কাছারি হইতে আসিয়া আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় গুড়গুড়ি টানিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছিলেন। এমন সময় সদানন্দ সেখানে আসিয়া পিতাকে জীবনবল্লভের চিঠির কথা জানাইলেন এবং তাঁহাকে শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতে হইবে একথাও বলিলেন। তাহার পর একথা সেকথায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া বিলাতগমনের যে ইঙ্গিত পাইয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া সদানন্দ নিজেও জীবনবল্লভের সহিত একত্রে বিলাতযাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

প্রতুলচন্দ্রের সামাজিক নির্য্যাতনের আতঙ্ক তাঁহাকে যেন ভূতাবিষ্টের

ন্যায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল! সমুদ্রযাত্রার প্রসঙ্গ হওয়া মাত্রই তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, মুখ হইতে গড়গড়ার নলটী আপনা হইতে খসিয়া ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিল! তিনি ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তৎপর নানা তর্কের অবতারণা করিয়া হিন্দু সন্তানের পক্ষে যে উহা নিতান্তই অবিধেয় তাহা বলিতে লাগিলেন এবং অবশেষে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদিরও উল্লেখ করিয়া পুত্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

সদানন্দ নীরবে পিতার কথা শুনিয়া গেলেন। কোন কথারই প্রতিবাদ করিলেন না। তবে মনে মনে তাঁহার সে সঙ্কল্প ক্রমেই দৃঢ় হইতে লাগিল। যাহা হউক অবশেষে এই স্থির হইল যে আগামী কল্যই সদানন্দ কলিকাতায় যাত্রা করিবেন এবং সেখানে তাঁহার বন্ধুকে বিদায় দিয়া আপাততঃ এম, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন। এদিকে প্রতুলচন্দ্রও ছোটলাট সাহেবের দপ্তরে পুত্রের জন্য ডেপুটিগিরির উমেদারি করিতে যত্নবান থাকিবেন।

পরদিন কথা প্রসঙ্গে প্রতুলচন্দ্র কৃষ্ণনাথ বাবুর অকাল মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারের অসহায় অবস্থার কথা তুলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কাহার ভাগ্যে যে কখন কি ঘটে বলা যায় না! ঈশ্বর না করুন পুত্র বিদেশে গেলে হঠাৎ যদি তাঁহার ভাল মন্দ কিছু ঘটে তাহা হইলে পরিবারের কি শোচনীয় অবস্থাই না হইবে এবং পুত্রকেও বিদেশে বিপাকে পড়িয়া কি বিপন্নই না হইতে হইবে! এই সকল কথা বলিয়া সদানন্দকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন। পুত্র কলিকাতা যাত্রা করিবার সময় একথাও বলিলেন যে তিনি শুনিয়াছেন কৃষ্ণনাথ বাবুর পরিবার কলিকাতার পটলডাঙ্গায় বাস করিতেছেন—সদানন্দ যেন একটু সময় করিয়া একবার তাঁহাদের সংবাদ লইতে যায়।

কলিকাতায় আসিয়াই সদানন্দ সর্ব্বাগ্রে জীবনবল্লভের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সেখানে উভয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সদানন্দ তখন পিতার অজ্ঞাতেই বিলাত যাওয়া স্থির করিলেন। কিন্তু অর্থের কি ব্যবস্থা হইবে এখন কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। পরে কথায় কথায় কৃষ্ণনাথ বাবুর পরিবারের গল্প উঠিল। জীবনবল্লভ ডাক্তার প্রাণতোষের বাড়ীতে সে পরিবারের কথা অনেক বার শুনিয়াছেন এবং একবার কি দুইবার কৃষ্ণনাথ বাবুর দুই মেয়েকেও তিনি সে বাড়ীতে দেখিয়াছিলেন। সদানন্দ জীবনবল্লভের নিকট হইতে তাঁহাদের বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া লইলেন এবং সেই দিনই বিকাল বেলায় পটলডাঙ্গার রায়-বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

কৃষ্ণনাথ বাবুর স্ত্রী স্বামীর কাছে প্রতুলচন্দ্রের কথা অনেক বারই শুনিয়াছিলেন। কাজেই সদানন্দ যখন আত্ম পরিচয় দিয়া দেখা করিতে গেলেন তখন রায়-গৃহিণী তাঁহাকে উপরে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং প্রথম দিনই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ন্যায় যুবককে সমাদর করিয়া সকল কথা তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া লইলেন। সদানন্দও মন্ত্রাভিভূতের ন্যায় অনর্গল বলিয়া গেলেন, কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করিলেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সদানন্দ অতিশয় সুপুরুষ এবং তাঁহার ব্যবহারও অতিশয় শিষ্ট। প্রখর বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্না সুচতুরা রায়-গৃহিণীও অবিলম্বে একান্ত আপন জনের ন্যায় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং কন্যা দিগকেও ডাকিয়া সেই দিনই তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া-দিলেন। তৎপর আদর আপ্যায়নের সহিত জলযোগান্তে যখন সদানন্দ বিদায় লইলেন তখন রায়-গৃহিণী সদলে সদর দরজা পর্য্যন্ত তাঁহাকে আগ

বাড়াইয়া দিলেন এবং পর দিন পুনরায় আসিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিলেন।

সদানন্দ যে ছাত্রাবাসে থাকিতেন, গ্রীষ্মাবকাশের ছুটী উপলক্ষে তথাকার প্রায় সকলেই দেশে চলিয়া গিয়াছেন। কেবল দুই জন মেডিকেল কলেজের ছাত্র এবং অপর দুইটী 'টুইশন' উপজীবিকাধারী শিক্ষক মাত্র তখনও সেখানে অবস্থান করিতেছেন। তিনি যখন পটলডাঙ্গা হইতে ফিরিলেন তখনও তাঁহাদের কেহই বাহির হইতে ফিরিয়া আসেন নাই। রান্নাঘরে ঠাকুর রন্ধন শেষে কলিকায় ইন্ধন যোগাইয়া গুড়ুকের ব্যবস্থা করিতেছে এবং ঝি বাবুদের জন্য 'ঠাঁই' করিয়া মেঝেতেই আঁচল পাতিয়া নিদ্রাদেবীর অঙ্কশায়িনী হইয়াছে। সদানন্দ বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়াই কোথাও কাহারো সাড়া-শব্দ না পাইয়া ঝিকে আলো দেখাইতে বলিলেন। ঠাকুর তাড়াতাড়ি হুঁকাটী রাখিয়া কেরাসিনের টিমিটি হাতে করিয়াই সিঁড়ির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সদানন্দ উপরে উঠিতে উঠিতে বলিলেন যে তিনি আজ রাত্রিতে আহার করিবেন না, তাঁহার ভাগ যেন সকলকে দিয়া দেওয়া হয়।

ঘরে প্রবেশ করিয়া আলো জ্বালাইতেই ঝি হাই তুলিতে তুলিতে আসিয়া নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলিল—"বাবু, এই নিন আপনার এক খানা চিঠি।"

সদানন্দ হাত বাড়াইয়া ঝির হাত হইতে চিঠি খানা লইয়াই খাম খানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং আলোর কাছে অগ্রসর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ঝি ততক্ষণ দরজার চৌকাঠে ঠেসান্ দিয়া পুনরায় ঝিমাইতে লাগিল।

পড়া শেষ হইলে সদানন্দ যখন মুখ ফিরাইলেন তখন ঝিকে

তথায় অপেক্ষা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঝি, আর কিছু খবর আছে ?"

ঝি তন্দ্রাভঙ্গে থতমত খাইয়া বলিল—"হ্যাঁ বাবু, জমিদার বাবুর দরওয়ান চিঠি নিয়ে এসেছিল। সে বলে গেল বাবু যেন কাল সকাল সকাল নেয়ে খেয়ে তয়ের হয়ে থাকেন। জমিদার বাবু এসে তাঁকে গাড়ী করে নিয়ে যাবেন।"

সদানন্দ—"আচ্ছা, ঠাকুরকে বলে রেখো কাল যেন স্কুল আফিসের মত তাড়াতাড়ি রান্না হয়। এখনকার মত এত বেলা করে যেন ভাত না দেয়।"

ঝি চলিয়া গেলে সদানন্দ দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং আর অপেক্ষা না করিয়া শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু সেদিন বহু আরাধনাতেও কিছুতেই নিদ্রাদেবীর কৃপা হইল না। কেবলই পটলডাঙ্গার রায়-পরিবারের আদর অভ্যর্থনার কথা, ছেলে মেয়েদের অসঙ্কোচ ব্যবহারের কথা, বিশেষ ভাবে বড় মেয়ে কুন্তলার সলজ্জ ব্যবহারের কথা, রায়-গৃহিণীর বিলাতগমনের জন্য তাঁহাকে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করা ; এমন কি অকুণ্ঠিত ভাবে অর্থের আশ্বাস দেওয়া—এই সকল মনে হইয়া তাঁহাকে এমন মোহবিষ্ট করিয়াছে যে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিবা মাত্র সেই দৃশ্য চলন্ত ছায়া-চিত্রের ন্যায় তাঁহার সমক্ষে উদ্ভাসিত হইতেছে !

কি করিয়া বিলাত যাত্রার ব্যবস্থা করিবেন সেই চিন্তায় সদানন্দ দিবারাত্র বিভোর হইয়া আছেন, তাহার উপর আজ এই এক অভিনব চিন্তাস্রোতে তাঁহাকে কোন্ এক মোহময় রাজ্যে টানিয়া লইতেছে ! বহু চেষ্টাতেও সারা রাত্রি চোখের পাতা এক করিতে পারিলেন না। সমস্ত রজনী অনিদ্রায় কাটিয়া

ভোর বেলায় একটু তন্দ্রা আসিল। সেই তন্দ্রার ঘোরে তখন স্বপ্ন দেখিলেন—

তিনি যেন বই বগলে করিয়া কলেজে যাইতেছেন। গোলদীঘীর কাছে যাইতে না যাইতেই দেখিলেন যে সম্মুখের ট্রামের লাইনটা যেন হঠাৎ মস্ত একটা নদী হইয়া গেল! তাহাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এক এক ঢেউ উঠিতে লাগিল। তিনি তখন তীরে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন কি করিয়া নদী পার হইয়া ঐ প্রেসিডেন্সী কলেজে গিয়া পঁহুছিবেন। এমন সময় তীরবেগে একখানা নৌকা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। ছোট একখানা পান্সী, তাহাতে একজন মাত্র মাঝি। নৌকাখানা পাড়ে ভিড়াইয়াই সে তাঁহাকে নৌকায় উঠিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে।

সদানন্দ নৌকায় পা দিবা মাত্র মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিন্তু খরস্রোতে মাঝি নৌকা সামলাইতে পারিল না—উহা ক্রমাগত একদিকে ভাসিয়া চলিল। পরে হঠাৎ মস্ত একটা ঢেউ আসিয়া নৌকাখানাকে কাত করিয়া ফেলিল। তিনি তখন টাল সামলাইতে না পারিয়া টলিতে টলিতে মাঝির কোলের উপর পড়িয়া গেলেন। তখন তাঁহার মাথা যেন বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, কিছুতেই আর চক্ষু মেলিতে পারেন না। এই ভাবে কতক্ষণ যে কাটিল সে জ্ঞান তাহার নাই!

তাহার পর যখন চক্ষু মেলিলেন তখন দেখিলেন যে নৌকায় তিনি আর কুন্তলা! কোথায় বা মাঝি আর কোথায় বা কি? তিনি কুন্তলার কোলেই মাথা রাখিয়া শুইয়া আছেন। তখন নিতান্ত লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইল। তাঁহার সমস্ত শরীর যেন অসাড় বোধ হইতে

লাগিল। তখন তিনি কি বলিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাও পারিলেন না! তাঁহার ঠোঁট দু-খানা কেবল একটু মাত্র নড়িয়া উঠিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কুন্তলা নত হইয়া তাঁহার ওষ্ঠে ওষ্ঠ মিলাইলেন! অমনি তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল এবং সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল! কপালে হাত দিয়া দেখিলেন ঘামে সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে।

পরদিন ঠিক সাড়ে দশটার সময় জীবনবল্লভ বাবুর গাড়ী আসিয়া ছাত্রাবাসের সম্মুখে দাঁড়াইল। সদানন্দ পূর্ব্বেই প্রস্তুত ছিলেন, কাজেই তাঁহার বাহির হইতে আর বিলম্ব হইলনা। তিনি গাড়ীতে উঠিতেই জীবনবল্লভ গাড়োয়ানকে লালদীঘী কুক্‌কোম্পানীর আফিসে যাইবার জন্য হুকুম দিলেন। তৎপর দুই জনে বসিয়া বিলাতযাত্রার আয়োজনের কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। কুক্ কোম্পানীতে জাহাজের বন্দোবস্ত করিয়া র‍্যাঙ্কিনের বাড়ী পোষাক আনিতে যাইবেন। সেখান হইতে আরো কয়েকটা সাহেবের দোকান ঘুরিয়া হগ সাহেবের বাজার, রাধাবাজার ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক যায়গায় আজ জীবনবল্লভ বাবুকে যাইতে হইবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে হইতে রায়-পরিবারের কথাও উঠিল এবং সদানন্দ সোৎসাহে কল্যকার সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। স্বপ্নের কথাটা বলিবার প্রলোভনও আর সামলাইতে পারিলেন না। সকল কথা শুনিয়া জীবনবল্লভ বলিলেন—"বেশ, বেশ, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান আপনি ব'ন। আর ভাবনা কি? তুমি কুন্তলাকে বিয়ে করতে রাজি হও, তা হলেই আর তোমার টাকার কথা ভাবতে হবেনা। আমি প্রাণতোষ বাবুর মায়ের কাছে শুনেছি ওঁরা জামাইকে বিলাত পাঠাবেন আগেই ঠিক করে রেখেছেন। এ বেশ ভালই হল। কুন্তলা

মেয়েটীও রূপেগুণে ভালই। ওরা প্রাণতোষ বাবুর মেয়েদের সঙ্গে পড়ে কিনা, তাই আমি সব শুনেছি।"

তারপর সদানন্দের হাতখানা নিজের হাতে লইয়া বলিলেন—তবে আর কি? এইবারে বল দুজন এক জাহাজেই যাওয়া ঠিক করে ফেলি। আজই কুককোম্পানীর ওখানে খবর নেওয়া যাক, কোন্ জাহাজে এক কামরায় দুইজন একসঙ্গে যাওয়ার মত যায়গা খালি আছে।"

সদানন্দ হাসিয়া বলিলেন—"আরে, এ যে দেখছি 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।' মোটে একদিন ত তাদের ওখানে গিয়েছি, ভাল করে এখনও কথাও হয় নাই। এরই মধ্যে তুমি যে একবারে হাতে চাঁদ তুলে দিচ্ছ।"

জীবনবল্লভ—"ভায়া হে, এক দিনেইত স্বপ্নদর্শন পর্য্যন্ত হয়ে গেল! আর কি চাই? আবার তাকে আকাশের চাঁদও মনে করছ। তবে আবার বাকীটা রইল কি? তারপর আজও ত ওখানে যাওয়ার নিমন্ত্রণ নিয়ে এসেছ; তোমার ত কেল্লা ফতে!"

সদানন্দ—"না—না, এখন তামাসার সময় নয়। কি করে যে যাওয়ার টাকার যোগাড় হবে তাই ভেবে ভেবে কুল কিনারা দেখিনা।"

জীবনবল্লভ—"আরে, টাকার যোগাড় ত হয়েই আছে। উপরন্তু একটা আকাশের চাঁদও হাতে পাচ্ছ। তোমার ত পোয়া বার।"

সদানন্দ—"না ভাই, তোমার ওসব ঠাট্টা তামাসা এখন রেখে দাও। কোনও কাজেরই শেষ পর্য্যন্ত না দেখে কিছু বলতে নাই। দেখি, আজ অবশ্য অনেকটা বুঝতে পারবো। পরিবারটী কিন্তু বাস্তবিকই খুব ভালই মনে হয়।"

জীবনবল্লভ তখন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন তারপর বলিলেন—"তা ভাল বই কি? আজই গিয়ে চাঁদের হাট বসিয়ে দাও!"

তবে হাটের সমস্ত সওদাই যেন তুমি একলা গাপ করে ফেলো না। অন্যের জন্যও কিছু রেখো।”

সদানন্দ—“না ভাই, হাসি নয়। একটা কথার কথা বলছি। যদিই আমার ওখানে একটা হয়ে যায় তবে তোমাকে প্রমীলার সঙ্গে জুটিয়ে দিবই। ও মেয়েটী ভারি সরল।”

জীবনবল্লব—“আমার আর কাজ নাই, তুমি একাই সব নিও। আজ তা হলে কখন আবার যাচ্ছ?”

সদানন্দ—“তুমিই বলনা কখন ফিরবে? যদি বেশী দেরী হয়ে যায় তবে না হয় আমাকে যাবার পথে গোলদীঘীর কোণে নামিয়ে দিও।”

জীবনবল্লভ—“তা, তুমি বরং এখনই যাও না। আমি একাই সব ঠিক করে আসতে পারবো।”

সদানন্দ—“আর অভিমান করতে হবে না। আমি কি তাই বলছি?”

জীবনবল্লভ—“বাকীটাই বা কি রাখছো? যাক, তোমাকে ঠিক চারটার সময় ওদের বাড়ীর সামনেই নামিয়ে দিয়ে যাব। তাহলেই হবে ত?”

সদানন্দ—“বাঃ, আমি কি বলছি যে হবে না?”

দুইজনে এইরূপ কথা হইতেছে, গাড়ী আসিয়া ততক্ষণে কুকের বাড়ীর দরজায় থামিল।

ইহার পর জীবনবল্লভ তাঁহার সমস্ত কাজ শেষ করিয়া চারটা বাজিবার কিছু আগেই সদানন্দকে পটলডাঙ্গায় রাখিয়া গেলেন। সে দিন শনিবার—বেথুন স্কুলের ছুটী। সদানন্দ যখন রায়-বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন তখন কুন্তলা রাস্তারদিকের বারান্দায় বসিয়াছিলেন। তাঁহার চম্পককলি অঙ্গুলিগুলি ক্রুশের কাঁটা দ্রুত চালনা করিতেছিল, কিন্তু

মনটা পথের দিকে চাহিয়া কোন্ এক অজানা রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিল। সদানন্দের সুদর্শন কান্তি এবং মৃদুমধুর হাসির কথা মনে হইতেছিল কি? কে জানে? যুবতীর মন বোঝা ভার!

সদানন্দকে দেখিয়াই ছেলেরা ছুটিয়া নীচে আসিল এবং তাঁহাকে হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেল। গৃহিণী সদানন্দকে দেখিয়াই "এস বাবা, এস, তোমার মুখখানা যে শুকনো দেখছি" এই বলিয়াই তাঁহাকে কাছে বসাইলেন এবং পাখাখানা হাতে করিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। সদানন্দ তাহাতে বাধা দিতে গেলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ছোট ছেলেকে দিয়া কুন্তলাকে ডাকিয়া আনাই-লেন। তারপর সদানন্দের কাছে যখন শুনিলেন যে সারাদিন ঘুরিয়া তিনি এইমাত্র এখানে আসিয়াছেন তখন গৃহিণী কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তাই ত, বাছার মুখখানা একবারে শুকিয়ে গেছে! তুমি ততক্ষণ একটু বাতাস কর, আমি ওর খাবারটা ঠিক করে আনি।" এই বলিয়াই কুন্তলার হাতে পাখাখানা দিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

তৎপর সদানন্দের জলযোগ শেষ হইলে অপর ছেলে মেয়েরাও আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। তখন কত কথাই হইতে লাগিল। সে দিন কোথায় কোথায় গিয়াছিলেন, জীবনবল্লভ বাবু তাঁহাকে এক জাহাজেই যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন ইত্যাদি এবং অন্যান্য বহু কথা হইল। জীবনবল্লভের সহিত একত্রে যাইবার প্রস্তাবে রায়-গৃহিণীও তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এইভাবে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। সে দিন ক্রমে সম্বন্ধ এতটা ঘনিষ্ট হইয়া উঠিল যে ছেলে মেয়েরা মাতার ইঙ্গিতে সদানন্দকে 'রাঙ্গাদাদা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। তাহার পর রাত্রির আহার সেখানেই শেষ করিয়া তবে তিনি সে দিনকার মত ছুটী পাইলেন!

পরদিন রবিবার। রায়-পরিবারের ছেলেমেয়েরা সেদিন শিবপুর কোম্পানীর বাগানে বেড়াইতে যাইবে এবং তাহাদের 'রাঙ্গা-দাদা'কেও সেই সঙ্গে যাইতে হইবে ইহাও স্থির হইয়া গেল। কাজেই সদানন্দকে রবিবার প্রাতে সকাল সকাল স্নানাদি শেষ করিয়া পুনরায় রায়-বাড়ীতে আসিয়া জুটিতে হইল। সেখান হইতে দুই খানা গাড়ী করিয়া চাঁদপাল ঘাটে আসিয়া তথায় একখানা বজ্‌রা (গ্রীনবোট) ভাড়া করিয়া সকলে তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। ভাটার স্রোতে তরণী ছুটিয়া চলিল। তখন সদানন্দের কেবলই সে দিনকার স্বপ্নের কথা মনে হইতে লাগিল !

সে দিনও সারাদিন সদানন্দের আনন্দ কোলাহলের ভিতরই কাটিয়া গেল। ক্রমেই তাঁহার চাঁদের হাট জমিতে আরম্ভ হইল! এই ভাবে প্রতিদিন সদানন্দের রায়-বাড়ীতে যাতায়াত চলিতে লাগিল। অবশেষে জীবনবল্লভের ভবিষ্যৎবাণীই ফলিয়া গেল। আপাততঃ রায়-গৃহিণী সদানন্দকে বিলাতে যাওয়ার খরচ এবং সেখানে গিয়াও কয়েকমাস থাকিবার মত কিছু টাকা হাতে দিয়া দিবেন স্থির হইল এবং সদানন্দও সানন্দে কুন্তলার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তবে উদ্বাহক্রিয়াটা বিলাত হইতে ফিরিবার পরই সম্পন্ন হইবে ইহাও একরূপ স্থির হইয়া গেল। ততদিন উভয়ে অগত্যা লিপিযোগেই প্রণয়-পিপাসা প্রশমিত করিবেন এই ব্যবস্থাই হইল।

ইহার পর এক দিন জীবনবল্লভ সদানন্দকে লইয়া কুক্‌কোম্পানীর আফিসে গেলেন এবং পি এণ্ড-ও-কোম্পানীর 'সুমাত্রা' জাহাজে একটী কামরায় এখনও কয়েকজনের মত স্থান আছে জানিতে পারিয়া তাহার দুইটি ঠিক করিয়া আসিলেন। ইহার এক পক্ষ কাল পরই উভয়ে এক

সঙ্গে চাঁদপাল ঘাট হইতে জাহাজে উঠিলেন। যাওয়ার দিন রায়-পরিবারের সকলে, ডাক্তার প্রাণতোষের পুত্রকন্যাগন এবং জীবনবল্লভের কন্যাসহ নীরোদবাসিনী জাহাজ-ঘাটে বিদায় লইতে আসিলেন। ইহাছাড়া জীবনবল্লভের অপর কয়েকটি বিশেষ বন্ধু এবং জ্যেষ্ঠ প্রাণবল্লভ বাবুও উপস্থিত ছিলেন।

আঠার

প্রবাস-কালে

অনেকদিন সদানন্দের কোনও সংবাদ না পাইয়া প্রতুলচন্দ্র নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। রঙ্গপুর হইতে যাওয়ার পর তাঁহার দুইখানা চিঠি পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর মাসাধিক কাল অতীত হইতে চলিল তাঁহার আর কোনই খবর নাই। সে দিন ব্যস্ত হইয়া কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় ডাকে এক-খানা চিঠি পাইলেন। হাতের লেখা দেখিয়া চিনিলেন যে এ সদানন্দেরই চিঠি, কিন্তু খামের উপর এডেনের ছাপ দেখিয়া তাঁহার বুকটা যেন হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল! তাড়াতাড়ি চিঠি খুলিয়া দেখিলেন যে সদানন্দের চিঠিই বটে।

চিঠিতে বিলাতযাত্রার কথা ও কৃষ্ণনাথ বাবুর জ্যেষ্ঠাকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়াছে এবং তাঁহারাই বিলাতের খরচপত্র বহন করিবার ভার লইয়াছেন সে কথা স্পষ্ট করিয়াই লেখা ছিল। যে বিধবাবিবাহের জন্য তাঁহাকে একবার 'নাকে খৎ' দিতে হইয়াছে এখন ছেলেও আবার সেই দলেই গিয়া ভিড়িল ভাবিয়া তিনি নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিতে লাগিলেন! তখন মনে মনে এই ভাবিয়া অনুশোচনা হইতে লাগিল যে তিনি নিজে কেন পুত্রের বিলাত গমনের ব্যবস্থা করিলেন না, তাহা হইলে ত পুত্রকে এভাবে পরের হাতে তুলিয়া দিতে হইত না। এখন যে সম্বন্ধ কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয় তাহা ত হইবেই এবং সঙ্গে সঙ্গে পুত্রও হাতছাড়া হইয়া যাইবে।

এ কথা যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই তাঁহার মন রায়-পরিবারের প্রতি বিষাক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

রায়-গৃহিণীর ইচ্ছা ছিল জামাতা বাবাজি ব্যারিষ্টার হইয়া আইসেন। কারণ কোনও চাকুরীতেই ব্যারিষ্টারীর মত এত প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সদানন্দ নীরিহ প্রকৃতির লোক। তিনি ভাবিলেন ও সব ধড়িবাজ লোকের কাজ, আর মামলামোকদ্দমার হেপায় থাকা তাঁহার কর্ম্ম নয়। কাজেই তিনি সেদিকে ঘেঁসিতে সাহসী হইলেন না। তা ছাড়া লণ্ডনের অধিক ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া তিনি এডিনবরায় থাকিয়া শিক্ষালাভ করাই সঙ্গত মনে করিলেন। জীবনবল্লভও তখন সদানন্দের সহিত এডিনবরাতেই গেলেন এবং সেখানে বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

স্কটলণ্ডের প্রধান নগর এই এডিনবরা সহরটি অতি মনোরম। ইহার সৌন্দর্য্যখ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত। শহরের রাজপথের মধ্যে কাষ্ঠাচ্ছাদিত প্রিন্সেস ষ্ট্রিটই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই রাস্তার ধারে বড় বড় সুসজ্জিত দোকান দেখিলে নয়ন মুগ্ধ হয়। ইহারই একস্থানে উদ্যানমধ্যে স্কটের স্মৃতি-মন্দির। এডিনবরা তাঁহার স্মৃতিপূত— তাঁহার রচনায় স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় পরিস্ফুট! সেই মন্দিরে যাইয়া সুপ্রসিদ্ধ কবি ও ঔপন্যাসিক স্কটের মর্ম্মর-মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতিভার উদ্দেশে অনেকেই শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। এ স্থানটি জীবনবল্লভের বড়ই প্রিয় ছিল।

এডিনবরাবাসিরা বলেন প্রিন্সেস ষ্ট্রীটের শোভা 'সজীব কুসুমে'— অর্থাৎ সুন্দরী সমাগমে। তথাকার আবহাওয়ার গুণে শহরে সুন্দরীরও অভাব নাই। যুবতীরা সুবেশে সজ্জিত হইয়া দলে দলে এই রাস্তায় ভ্রমণে বহির্গত হন। বলা বাহুল্য, সৌন্দর্য্যপিপাসু দর্শকগণেরও তখন

যথেষ্ট সমাগম হয়। রূপের পসরা লইয়া রূপসীরা আসেন রূপ দেখাইতে —আবার বুভুক্ষিত পতঙ্গের দল সমাগত হন সে রূপবহ্নিতে দগ্ধ হইতে!

জীবনবল্লভের উদরান্ন সংস্থানের ভাবনা নাই, কাজেই তাঁহার বিলাতগমনের উদ্দেশ্য বিদ্যাচর্চ্চা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। মফঃস্বল-শহর হইতে নবাগত ছাত্রগণ কলিকাতায় আসিলে যেমন নানা অভিনব দৃশ্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের চিত্তবিক্ষেপের কারণ ঘটিয়া থাকে, এ দেশীয় যুবকদিগের বিলাতগমনে তাহা অপেক্ষাও সহস্রগুণ অধিক প্রলোভনের আবর্ত্তে পড়িয়া তাহাদিগকে হাবুডুবু খাইতে হয়! আত্মসংযমে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তি সে খরস্রোতে কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। বিলাসের ক্রোড়ে লালিত ধনীসন্তানগণ সাধারণতঃ চিত্তসংযমে অনভ্যস্ত। কিন্তু জীবনবল্লভ সে প্রকৃতির ছিলেন না। অধ্যয়নে একাগ্রতা এবং জ্ঞানান্বেষণে প্রবল তৃষ্ণা দেখিয়া তাঁহার প্রতি অচিরেই অধ্যাপকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

এডিনবরায় পঁহুছিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইবার পর সদানন্দ তাঁহার পিতাকে সে সংবাদ দিলেন। অভিমানভরে প্রতুলচন্দ্র সে চিঠির কোনই জবাব দিলেন না। তাহার পর ছয় মাস কাটিয়া গেল তিনি পুত্রের আর কোন সংবাদও পাইলেন না। পুত্র শত অপরাধ করিলেও পিতা কখনই তাহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন না। পুত্রের সংবাদের জন্য পিতার মন ক্রমেই চঞ্চল হইয়া উঠিল! এই সময়ে একদিন সদানন্দের অসুখের সংবাদ আসিল এবং সেই সঙ্গে অর্থাভাবে তাঁহার নিতান্ত ক্লেশ হইতেছে একথাও জানিতে পারিলেন।

পুত্রের অসুখের সংবাদ পাইয়া প্রতুলচন্দ্র আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। পরের ডাকেই কিছু টাকা পাঠাইয়া দিলেন এবং

একথাও লিখিয়া দিলেন যে এখন হইতে তিনিই প্রতিমাসে নিয়মিত ভাবে টাকা পাঠাইবেন। তাছাড়া ইহাও লিখিলেন যে রায়দের নিকট হইতে আর কোনও অর্থসাহায্য গ্রহণ করিবার আবশ্যক নাই। তাহারা এপর্য্যন্ত যে টাকা দিয়াছে তাহাও তিনি ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। কাজেই ইহার পর ওবাড়ীতে বিবাহ করিবারও তাঁহার আর কোনই দায়িত্ব থাকিতে পারে না।

ইহার পর হইতে সদানন্দ পিতার অর্থ নিয়মিত রূপেই পাইতে লাগিলেন। তখন আর রায়-গৃহিণীর নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণের কোনই আবশ্যক রহিল না। কিন্তু অর্থপ্রেরণে অব্যাহতি দেওয়ার ফলে ভাবী পত্নীর প্রণয়-লিপির সহিত ভাবী শাশুড়ীর মমতা পূর্ণ চিঠির সংখ্যা অনুপাতে বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল!

যে বৎসর জীবনবল্লভ বিলাত গমন করেন তাহার পর বৎসর শ্বশুর তারিণীকান্ত রায় মহাশয় হঠাৎ অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়েন। রোগের বৃদ্ধি দেখিয়া সদর হইতে ডাক্তার সাহেবকে আনান হইল। তিনি আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন পাকস্থলীর কিম্বা অন্ত্রের প্রদাহ বলিয়াই সন্দেহ হইতেছে। তবে ঠিক নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক রোগ যে অতিশয় গুরুতর সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। আর কাল বিলম্ব না করিয়া রোগীকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়াই সঙ্গত।

তখন ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল খোলা হইয়াছে এবং নারায়ণগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ষ্টীমার চলাচলের ব্যবস্থাও হইয়াছে। রাত্রি দশটায় ময়মনসিংহ হইতে ডাকগাড়ী ছাড়ে এবং ভোর বেলায় নারায়ণগঞ্জে পঁহুছে। সেখান হইতে প্রাতে ৬টায় ষ্টীমার ছাড়িয়া রাত্রি ৯টায় গোয়ালন্দ পঁহুছে। তৎপর সেখান হইতে রাত্রি ১০টায় গাড়ীতে

উঠিলেই পরদিন ভোরে শিয়ালদহ উপস্থিত হওয়া যায়। কাজেই কলিকাতা যাইতে হইলে আর পূর্ব্বের ন্যায় বিলম্ব হইত না।

ডাক্তার সাহেবের ব্যবস্থা মত অবশেষে রোগীকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়াই স্থির করা হইল। সেই দিনই সমস্ত আয়োজন করিয়া পরদিন রাত্রিতেই রোগীকে লইয়া ময়মনসিংহ হইতে যাত্রা করা হইল। সঙ্গে রহিলেন পুত্র অবনীকান্ত এবং তাঁহার মাতা। তা ছাড়া দাস-দাসী, দরওয়ান, গোমস্তা প্রভৃতি অনেকেই গেল। কলিকাতায় পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের জন্য বীডনষ্ট্রীটে এক বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। সেখানে যাওয়ার পর রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল এবং অবশেষে মেডিকেল কলেজের প্রধান ডাক্তার আসিয়া অস্ত্রোপচারও করিলেন। কিন্তু কিছুতেই সুফল হইল না। কলিকাতায় আগমনের তিন সপ্তাহ পরই রায় মহাশয় গঙ্গাতীরে দেহরক্ষা করিলেন।

উর্ম্মিলা দেবীর মৃত্যুর পর হইতেই ঊষাবালা নীরোদবাসিনীর কাছে রহিয়াছে একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জীবনবল্লভ বাবুর বিলাতযাত্রার পর জ্যেষ্ঠতাত প্রাণবল্লভ তাহাকে দেশে লইয়া যাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু বালিকা নীরোদবাসিনীকে ছাড়িয়া কিছুতেই যাইতে রাজি হইল না। সে তখন স্পষ্টই বলিয়াছিল জ্যেঠামহাশয় ভালবাসিলে কি হয়, জ্যেঠাইমা তাহাকে একটুও ভালবাসেন না। সে নীরুমাসীকে ছাড়িয়া আর কোথায়ও যাইবে না।

পুত্র অবনীকান্ত নৈহাটীতে যথারীতি শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। বিধবা মাতা ব্রহ্মময়ী দেবী বিডনষ্ট্রীটের বাড়ীতেই কিছুকালের জন্য রহিয়া গেলেন। গয়া-কাশী ইত্যাদি তীর্থপর্য্যটন শেষ করিয়া একবারে দেশে ফিরিবেন এই তাঁহার অভিপ্রায়। দিদিমা কলিকাতাতে আসিয়াই নাতিনী ঊষাবালাকে

তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন। সেখানে থাকিতে বালিকা বিশেষ কোনও আপত্তি করিলনা। দিদিমার গলা জড়াইয়া শুইয়া থাকিতে এবং 'বেঙ্গম-বেঙ্গমীর' গল্প শুনিতে তাহার বড়ই ভাল লাগিত। তবে নীরুমাসীর কথা একবারে মনে হইত না তাহা নয়।

উষাবালা চলিয়া গেলে নীরোদবাসিনীর বড়ই ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। বালিকাকে লইয়া তাঁহার সারাদিন একরূপ বেশ কাটিয়া যাইত। এখন সুদীর্ঘ অবসর তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল এবং ব্যর্থ জীবনের অব্যক্ত পাষাণচাপে হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিলেন। এক সপ্তাহ পরই আবার বালিকাকে আনিবার জন্য ভগীরথকে বীডনষ্ট্রীটে পাঠাইয়া দিলেন। ভগীরথকে দেখিয়াই বালিকা নীরুমাসীর কাছে যাইবার জন্য নাচিয়া উঠিল এবং তখন দিদিমাকে ছাড়িয়া যাইতেও একটু দ্বিধা বোধ করিল না।

দিদিমা যতদিন কলিকাতায় ছিলেন বালিকা ততদিন এবাড়ী ওবাড়ী করিয়া বেড়াইত। কিন্তু তিনি তীর্থভ্রমণে বাহির হইলে পুনরায় সে স্থায়ীভাবে নীরোদবাসিনীর কাছেই আসিয়া রহিল। তাহার পর দেশে ফিরিয়া যাইবার কালে দিদিমা নাতিনীকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা, করিয়াছিলেন। কিন্তু নীরোদবাসিনীর আকর্ষণই প্রবল হইয়া বালিকার মনে দিদিমার আদর অপেক্ষাও প্রভাব বিস্তার করিল!

মাতা তীর্থপর্য্যটন শেষ করিয়া দেশে ফিরিলে কন্যা বিমলাকে একবার দেখিতে আসিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বিমলা দেবীর এই প্রথম মাতার সহিত সাক্ষাৎ। দর্শনমাত্র উভয়েই যথারীতি ক্রন্দন করিলেন এবং মাতার নববৈধব্য বেশে বৈরাগ্যের ছায়াপাত দর্শনে কন্যার চিত্তও কেমন বিবশ হইয়া গেল। অনেকক্ষণ উভয়েই নীরবে

কাটাইলেন। তৎপর বিমলা পিতার শেষ সময়ের কথা সবিস্তার শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে মাতা যথাসম্ভব তাহা বিবৃত করিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে উর্ম্মিলা দেবীর মৃত্যুর কথাও আসিয়া পড়িল এবং তখন মাতার প্রচ্ছন্ন শোকাবেগ উদ্বেলিত হইয়া পুনরায় অশ্রুধারায় বক্ষ প্লাবিত করিল। ইহার পরই মৃতার একমাত্র নিদর্শন নাতিনী ঊষাবালার কথা তুলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বালিকা দিদিমার বুকভরা আদর অগ্রাহ্য করিয়া এক অনাত্মীয়া অপরিচিতার মোহে মুগ্ধ হইয়া রহিল একথা শুনিয়া বিমলা দেবী সেই মায়াবিনী নীরোদবাসিনীকে একমাত্র 'ডাইনী' নামে অভিহিত করা ছাড়া উপায়ান্তর দেখিলেন না। এবং একথাও স্পষ্ট করিয়া তাঁহাকে বলিতেই হইল যে এই বালিকা হইতেই তাঁহাদের গৃহের অনাগত অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

দুই বৎসর পর সদানন্দ তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। জীবনবল্লভ পরীক্ষা পাশ করিয়া সেখানকার বিজ্ঞানাগারে ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যার শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিজ্ঞান শিক্ষার সহিত তিনি তথাকার সামাজিক রীতিনীতিও বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে ব্যাপৃত রহিলেন। এই সময়ে আরও কয়েকজন বাঙ্গালী এবং ভারতীয় ছাত্র এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। সদানন্দ চলিয়া আসাতে তিনি যেমন বিদেশে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তখন আর সে অভাব বোধ হইল না।

ইহার কিছুদিন পর, কৃষ্ণনাথ রায়ের পুত্র প্রীতিনাথও তথায় গিয়া

জুটিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় অসাধারণ। তিনি মিতব্যয়ী, মিতাচারী এবং মিতভাষী। এমন স্বল্প ব্যয়ে এ পর্য্যন্ত কোনও ছাত্রই বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিতে পারেন নাই। তিনি যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ-পথ হইতেই সাগরপারে সরিয়া পড়িলেন এবং পাঁচ বৎসরেই এডিনবরা মেডিকেল কলেজ হইতে সসম্মানে ডিগ্রি লাভ করিয়া আসিলেন, তেমনি মাসিক মাত্র পঞ্চাশ টাকা ব্যয়ে সেখানে বাসাখরচ চালাইয়া ছিলেন। তাঁহার মিতব্যয়ীতার একটীমাত্র দৃষ্টান্ত এই দিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি নিজ হাতে তাঁহার পোষাকপরিচ্ছদ সিলাই করিতেন। বিলাতযাত্রা কালে এখান হইতে যে পাঁচটী নিব ও তিনটী স্থচ সঙ্গে নিয়াছিলেন, পাঁচবৎসর বিলাতবাসের পর যখন ডাক্তার হইয়া দেশে ফিরিলেন তখনও সেই নিবের দুইটী এবং স্থচ তিনটী ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

জীবনবল্লভের সহিত প্রীতিনাথ সেখানে এক বাড়ীতেই বাস করিতেন। অতি সত্বরেই উভয়ের মধ্যে সৌহৃদ্য হইয়াছিল। জীবনবল্লভের সহজ-স্বভাব অমায়িক ব্যবহারে সকলকেহ আকৃষ্ট করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে দুই-ই জ্ঞানপিপাসু এবং বাহ্য আড়ম্বর বিরহিত। কাজেই পরস্পর আকৃষ্ট হইতে বিলম্ব ঘটিল না। কিন্তু অপরদিকে লেণ্ডলেডী-কন্যার হাবভাবের প্রভাব এবং প্রণয়-প্রবণতার উচ্ছ্বাসাবেগ নিতান্তই ব্যর্থকাম হইল!

প্রীতিনাথের বিলাত গমনের দুই বৎসর পরই জীবনবল্লভ দেশে ফিরিবার মনস্থ করিয়া এডিনবরা ত্যাগ করিলেন। তৎপর কিছু দিন প্রসিদ্ধ দর্শনীয় কয়েকটী স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কয়েকটী বাঙ্গালী যুবকের সহিত এক-বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিলেন। প্রথম কয়েকদিন লণ্ডনের যাহা

কিছু বিশেষ দ্রষ্টব্য তাহা দেখিতেই কাটিয়া গেল। তাহার পর এক সপ্তাহ এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইলেন। কিন্তু এ ভাবে আর বেশী দিন কাটাইতে পারিলেন না। দেশের জন্য মন তখন বড়ই উতলা হইয়া উঠিল!

উনিশ

গ্রন্থি শিথিল

জীবনবল্লভ সত্বরেই দেশে ফিরিতেছেন এ সংবাদ যখন প্রাণবল্লভের কাছে পঁহুছিল তখন পত্নী বিমলা দেবী দেবরের দেশে আগমনের পূর্ব্বেই উষাবালাকে বাড়ীতে লইয়া আসিবার জন্য পতিকে বারবার জেদ করিতে লাগিলেন। প্রাণবল্লভ সে কথার কোনও প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন যে জীবনবল্লভ কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিলে আপনা হইতেই বালিকা পিতার সহিত দেশের বাটীতে আসিতে সম্মত হইবে এবং সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই তাঁহার পক্ষে সঙ্গত। তবে প্রকাশ্যে বলিলেন যে তিনি শীঘ্রই এজন্য কলিকাতায় যাইবার আয়োজন করিতেছেন।

প্রাণবল্লভ আর দ্বিতীয় চিঠির অপেক্ষা না করিয়াই কলিকাতায় চলিয়া গেলেন এবং বাঙ্গালী-সাহেব মহলের কাছাকাছি এক খানা বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহা বিলাতপ্রত্যাগত ভ্রাতার উপযোগী করিয়াই সজ্জিত করিলেন। অবশ্য 'বয়', বাবুর্চ্চি প্রভৃতি নিযুক্ত করিতেও ক্রুটী হইল না। জীবনবল্লভ বোম্বাই হইতে রেলযোগেই কলিকাতা আসিবেন স্থির করিয়া সেখানে জাহাজ হইতে নামিয়াই কুক্‌কোম্পানীতে এবং ডাক্তার প্রাণতোষকে 'তার' করিয়া দিলেন। প্রাণতোষ বাবু যথাসময়ে প্রাণবল্লভ বাবুকে সে সংবাদ জানাইলেন। বোম্বাই ডাকগাড়ী হাবড়া ষ্টেশনে পঁহুছিবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই

প্রাণবল্লভ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহার কিছুকাল পরই প্রাণতোষের পুত্রকন্যাগণ ঊষাবালাকে লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

বাড়ীতে পঁহুছিয়াই জীবনবল্লভ সকলের নিষেধ সত্ত্বেও বিলাতি বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধুতি-পাঞ্জাবী পরিয়া যেন কতই আরাম বোধ করিলেন। কিন্তু হঠাৎ পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনের ফলে তাঁহাকে সর্দ্দীকাশীতে বেশ ভুগিতে হইয়াছিল। বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের এক সপ্তাহকাল পরই প্রাণবল্লভ ভাইকে দেশে লইয়া গেলেন এবং সেই সঙ্গে ঊষাবালাকেও যাইতে হইল। দেশের লোক এতকাল পরে জীবনবল্লভের প্রত্যাগমনের সংবাদ পাইয়া দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন এবং তাঁহার চিরকালের সেই অমায়িক ব্যবহারে অতিশয় মুগ্ধ হইলেন।

বাহিরে সকলেই জীবনবল্লভের সহিত শিষ্ট ব্যবহার করিলেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিশেষভাবে আন্দোলন উপস্থিত হইল। জীবনবল্লভ জাতিচ্যুত বলিয়া তফাৎ করিয়া দিবার অভিপ্রায় অবশ্য কাহারও ছিল না। তবে প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি একটা প্রায়শ্চিত্ত করিলেই নিরঙ্কুশ হইতে পারেন এবং সকলে তাঁহাকে সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। প্রাণবল্লভ এ প্রস্তাবে সহজেই স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু জীবনবল্লভকে কিছুতেই সম্মত করাইতে পারিলেন না।

আন্দোলন যখন ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল তখন প্রাণবল্লভ ভাইয়ের জন্য স্বয়ং প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি পোষাক পরিচ্ছদে, কাজকর্ম্মে এবং চালচলনে সর্ব্বপ্রকারেই পূরাদমে সাহেব ছিলেন। তখন সাহেবী হ্যাটকোট ও নেকটাই সমুদয় নবদ্বীপে গঙ্গার

জলে বিসর্জ্জন দিয়া তুলসীর প্রকাণ্ড মালা এবং মাখন-মাটির ফোঁটা-তিলক অঙ্গের ভূষণ করিলেন। সাহেবী আমলে আহারে বিহারে যে সকল ব্যভিচার হইয়াছিল এখন অনাহারে অনিদ্রায় এবং তপ-জপ নিদিধ্যাসনে দিবারাত্র অতিবাহিত করিয়া তাহার সম্যক প্রতিপূরণ করা হইল।

জীবনবল্লভের আহারাদির ব্যবস্থা বাহ্যভাবে পূর্ব্ব হইতেই পৃথক ছিল। কাজেই তাহা লইয়া সামাজিক আন্দোলনের তেমন কোনও সুযোগ ঘটিল না। এদিকে প্রাণবল্লভের অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনের প্রভাব ভেল্কীবাজির ন্যায় সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিল!

জ্যেষ্ঠের একান্ত অভিলাষ জীবনবল্লভ দেশে আসিয়া বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করেন। কিন্তু অন্দরে গৃহিণীর অভিলাষ অন্যরূপ। জাতি-চ্যুতি ঘটিলে পৈত্রিক বিষয় হইতে বঞ্চিত হইতে হয় একথা কেমন করিয়া বিমলা দেবীর কানে উঠিয়াছিল। তাই স্বামী যে দেবরকে এভাবে আগলাইয়া রাখিতে চান ইহা তাঁহার কাছে কিছুতেই সুবুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া মনে হইল না। এদিকে সেই ডাইনী মায়াবিনীকে ছাড়িয়া আসিয়া ঊষাবালা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিবার উপক্রম করিয়াছে। এ সকলের জন্য যে বিমলাকেই হাড়জ্বালাতন হইতে হয় এবং লোকেও তাঁহার প্রতি নানারূপ কটাক্ষ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না—পুরুষ মানুষেরা কি ইহা দেখিয়াও দেখে না? তাহাদিগের ঘটে যদি এতটুকও বুদ্ধি না যোগায় তবে জমিদারি ছাড়িয়া জটা-কৌপিন পরা ও লোটা-কম্বল সম্বল করাই ত তাহাদের পক্ষে সঙ্গত!

ঊষাবালা চলিয়া আসিলে নীরোদবাসিনীর প্রথম কয়েকদিন একরূপে কাটিয়া গেল। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহারও ক্রমে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিবার উপক্রম হইল। রাত্রিতে ঘুম হইত

না, মাথা দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে মনে হইত। তখন মস্তক শীতল করিবার জন্য গভীর রাত্রিতেও অঞ্জলি পূরিয়া মাথায় জল দিতেন। এইরূপ দিনে রাত্রিতে কতবার যে মাথা ধুইতেন তাহার ঠিক ছিলনা। সপ্তাহ দুই এইভাবেই কাটিল। তাঁরপর একদিন জ্বর-ভাব বোধ হইল। মাথা টন্ টন্ করিতে লাগিল এবং চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমে এক দিন দুই দিন করিয়া সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কিন্তু জ্বরের বিরাম হইল না।

প্রাণতোষ এতদিন নিজেই চিকিৎসা করিতেছিলেন। কিন্তু জ্বরের গতি ক্রমেই বেয়াড়া ভাব ধারণ করিতেছে দেখিয়া একজন অভিজ্ঞ এলোপ্যাথিক ডাক্তারকে ডাকা হইল। তিনি আসিয়া অনেকক্ষণ পরীক্ষার পর টাইফয়েড (জ্বর-বিকার) বলিয়া সন্দেহ করিলেন। তখন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জগদ্বন্ধু বসুকে আনা হইল। তিনিও রোগীকে পরীক্ষা করিয়া তাহাই বলিলেন এবং একুশ দিনের পূর্ব্বে জ্বর ছাড়িবার কোনই সম্ভাবনা নাই এ কথাও বলিয়া গেলেন।

এখন হইতে এলোপ্যাথিক চিকিৎসাই রীতিমত চলিতে লাগিল। কিন্তু রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না। বরং নিত্য নূতন উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল। তাহার পর বার দিনের দিন বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন হৃৎপিণ্ডের অবস্থাও অতিশয় খারাপ। বিকারের অবস্থায় রোগী মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠিত এবং দেওয়ালের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিত—খুকুমণি এসেছ ? আমায় এখন যেতে হবে যে, আমায় ছেড়ে দাও।" কখন ও বা বলিত—"খুকুমণি আমায় ধরে রাখছ কেন ? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমি এখন যাই।"

রোগের প্রথম হইতেই উষাবালাকে দেখিবার জন্য নীরোদবাসিনী

নিতান্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য জীবনবল্লভকে চিঠিও লেখা হইয়াছিল। কিন্তু বালিকার জ্যেঠাই মা রোগীর কাছে তাহাকে কিছুতেই লইয়া যাইতে দিলেন না। ডাইনীর হাত হইতে কত কষ্টে মেয়েটাকে উদ্ধার করা হইয়াছে, এমন নির্ব্বোধ কে আছে যে আবার তাহার কাছে মেয়ে পাঠায়? জীবনবল্লভও তখন নীরোদবাসিনীর এতটা অসুখ হইয়াছে বুঝিতে পারেন নাই। তাই বালিকা যাওয়ার জন্য অস্থির হইলেও বধূঠাকুরাণীর অনভিপ্রায়ে তাহাকে লইয়া যাইতে তিনি তেমন জেদ করিলেন না।

বিকারের অবস্থা দেখিয়া প্রাণতোষ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এ সময়ে উষাবালা সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে হয়ত রোগীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে এই ভাবিয়া তাহাকে লইয়া আসিবার জন্য জীবনবল্লভকে 'তার' করিয়া দিলেন এবং তাহাতে রোগীর বর্ত্তমান অবস্থাও যথাসম্ভব বিবৃত করিলেন। টেলিগ্রাম পাইয়া জীবনবল্লভ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কন্যাকে অসুখের কথা কিছু না বলিয়া পরদিনই তাহাকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

যেদিন ভোরে তাঁহারা শিয়ালদহ পঁহুছিলেন সে দিন নীরোদবাসিনীর রোগের এক পক্ষকাল অতীত হইয়াছে। সারারাত্রি রোগের যাতনায় ছট্ ফট্ করিয়া ভোর বেলায় তাঁহার একটু তন্দ্রাবেশ হইয়াছে। ভামিনী শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছেন। পুষ্পময়ী দিদির হাতে পাখাখানা দিয়া মাথার দিকের জানালাটা খুলিয়া দিলেন এবং প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া রোগীর ঘরের ঔষধ-পথ্যাদি রাখিবার টেবিলটা গুছাইতে লাগিলেন। এমন সময় বৃদ্ধা ঠাকুরমা ঘরে ঢুকিতেই ভামিনী চক্ষের ইঙ্গিতে তাঁহাকে কথা বলিতে নিষেধ করিলেন এবং পুষ্পময়ী আগাইয়া আসিয়া তাঁহার কানে কানে বলিলেন—"সারা রাতের

পর এইমাত্র দুটী চোখের পাতা এক করেছেন, এখন যেন একটুও শব্দ করোনা।"

মাতা ক্ষীরোদবাসিনী তখন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া নিদ্রিতা কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। এদৃশ্য দেখিবার জন্য কেন আজও তিনি বাঁচিয়া আছেন এই ভাবিয়া মনে মনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যেদিন নিরপরাধ নীরোদবাসিনীকে জন্মের মত প্রতুলচন্দ্রের ত্যাগ করিবার সংবাদ প্রথম তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল সে দিন যে মাথা ঘুরিয়া সংজ্ঞা হারা হইয়াছিলেন, তখনই কেন তাঁহার জীবন-বায়ু বহির্গত হইল না? তাহার পর পরের মেয়েকে বুকে আকড়াইয়া ধরিয়া হতভাগিনীর অন্তরের গোপন ব্যথায় যে প্রলেপটুকু দিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি পাইতেছিল তাহা স্থায়ী হইবার আশা করা যে নিতান্তই মনের ভ্রম! হায়, কোন্ অজ্ঞাত অপরাধ বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত?

পুষ্পময়ী টেবিলটী গুছাইয়া রাখিয়া মুখহাত ধুইবার জন্য নীচে নামিয়া গেলেন। এমন সময় রাস্তায় দরজার কাছে আসিয়া এক খানা গাড়ী দাঁড়াইল। পুষ্পময়ী কৌতুহলী হইয়া সেই দিকে চাহিতেই দেখিলেন গাড়ীর ভিতর হইতে একটি বালিকা নামিয়াই পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং গাড়ীর ভিতরে কাহার সহিত যেন কথা বলিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে উপরে রোগীর ঘর হইতে ঝন্-ঝন্-ঝনাৎ করিয়া একটা শব্দ হইল এবং পর মুহূর্ত্তেই ভামিনী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"পুষ্প, শীগ্গির বাবাকে ডেকে দে, পিসীমা কেমন করছেন।"

দিদির ডাক শুনিয়াই পুষ্পময়ী ছুটিয়া উপরে গেলেন। প্রাণতোষও তৎক্ষণে সে শব্দে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াই অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া

নীরোদবাসিনীর ঘরের দিকে ছুটিলেন, পশ্চাতে গৃহিণী সুষমাও মাথার কাপড় টানিতে টানিতে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। পুষ্পময়ী ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বেই দেখিলেন সারদার কাবুলী বিড়ালটা তাহার চামর-পুচ্ছটী খাড়া করিয়া তিন লাফে তাঁহার পাশ দিয়া নীচে নামিয়া গেল। তারপর সকলে ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখিলেন মেঝের উপর ঔষধ খাওয়ার কাচের গ্লাসটা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়া আছে, টেবিলের জিনিষপত্রগুলি ওলটপালট হইয়া এবং ঔষধের শিশি ভাঙ্গিয়া পথ্য ও ঔষধ সব গড়াইয়া পড়িতেছে। ওদিকে রোগীর দাঁত লাগিয়া গিয়াছে এবং সংজ্ঞা লোপ হইয়াছে!

তখন বিড়ালের কাণ্ড বুঝিতে কাহারো বাকী রহিল না এবং হঠাৎ শব্দ হওয়াতেই তন্দ্রার ঘোরে চমকাইয়া রোগীর দুর্ব্বল মস্তিষ্কের ক্রিয়া স্তম্ভিত হইয়া এরূপ ঘটিয়াছে প্রাণতোষের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি প্রথমেই রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। তৎপর চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়া মাথায় বরফ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন।

কিছুক্ষণ পরই রোগীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। উত্তেজক ঔষধ মুখে দেওয়া মাত্র তাহা হাঁ করিয়া মুখে লইয়া গিলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তখনও চক্ষু বুজিয়াই রহিলেন। এইভাবে কিছুকাল কাটিল। তাহার পর হঠাৎ চক্ষু মেলিয়াই যেন কাহাকে খুঁজিতে লাগিলেন। এদিক ওদিক একটু তাকাইয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন এবং সজোরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া যেন ডাকিয়া উঠিলেন—"খুকুমণি"! এই কথা উচ্চারণ করিবা মাত্র দরজার আড়াল হইতে ঊষাবালা ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং নীরুমাসীর বুকের উপর ঝাপাইয়া পড়িল!

ঊষাবালা আসিবার পর রোগীর অবস্থার যেন একটু পরিবর্ত্তন হইল। জ্বরের প্রকোপও অনেকটা কমিয়া আসিল এবং বিকারের

ভাবও কতকটা দূর হইল। সকলের মনেই তখন আশার সঞ্চার হইল। তবে ডাক্তার বলিলেন যে অমাবস্যা না কাটিলে কিছুই নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। তাই শুশ্রূষাকারীদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন।

এই ভাবে কয়দিন কাটিল। তাহার পরই জ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। অন্ত্রের অবস্থাও নিতান্ত খারাপ হইয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে ঘোর বিকারের ভাব দেখা দিল! প্রলাপের অবস্থায় অধিকাংশ সময়ই কেবল ঊষাবালার কথাই হইত। "খুকুমণি, আমায় যেতে দাও—আর আমায় ধরে রাখ কেন? না-না, আমাকে যেতে হবে—ও কি কর খুকুমণি, ছাড়, ছাড়—আমার দেরী হয়ে গেল যে!" এই ভাবের কথাই অধিক। তখন দারুণ আতঙ্কে সকলের দিন কাটিতে লাগিল!

অবশেষে ভিষক-বৈদ্যের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া এবং আত্মীয় স্বজনের আকুল আগ্রহ উপেক্ষা করিয়া একুশ দিনের দিন সন্ধ্যাবাতি জ্বালিবা মাত্র নীরোদবাসিনীর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল!

*   *   *   *

ঊষাবালা এখন আর নিতান্ত বালিকা নহে। এবারে সে দশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। মাতার মৃত্যুকালে সে উপস্থিত ছিলনা এবং তখন সে মাত্র পাঁচ বৎসরের শিশু। কাজেই সে কথা তাহার বিশেষ কিছুই মনে নাই। কিন্তু এবারে নীরোদবাসিনীর মৃত্যু তাহার মনে গভীর দাগ বসাইয়া গেল। সে প্রথম হইতে কাছে থাকিলে হয় ত আজ নীরুমাসীকে হারাইতে হইত না—একথা যখনই ভাবে তখনই তাহার মন নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়ে! কেন যে সে মরিতে দেশে গিয়াছিল এই ভাবিয়া দারুণ আক্ষেপ করিতে থাকে।

এবারে যে সে প্রকৃতই মাতৃহারা হইয়াছে—আপন বলিয়া বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে সে যে আজ আর কাহাকেও খুঁজিয়া পায় না!

নীরোদবাসিনীর মৃত্যুর পর জীবনবল্লভ কন্যাকে পুনরায় দেশে লইয়া যাইতে চাহিলে সে কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইল না। তখন অগত্যা জীবনবল্লভকে কলিকাতাতেই স্থায়ী ভাবে বাস করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইল। ভৃত্য বাঞ্ছারাম সঙ্গেই ছিল, এখানে 'বয়' ও বাবুর্চ্চি এবং উষাবালার জন্য একজন 'আয়া' নিযুক্ত হইল। প্রাণতোষ বাবুর বাড়িতে থাকিতে উষাবালা নীরুমাসীর কাছেই লেখা পড়া করিত। এখানে বাড়ীতে আসিয়া পড়াইবার ও সূচের কাজ শিখাইবার জন্য একজন মেম নিযক্ত করা হইল।

ইহার পর দুই বৎসর কাটিল। এভাবে একাকী এত বড় মেয়েকে লইয়া বিদেশে থাকা কখনই উচিত নয় আর মেয়েরও দিন দিন বাড়ীর দিকে টান কমিয়া যাইতেছে! মেয়ে দেশে আসিবে না—অতটুকু মেয়ের এ কেমন জেদ? আর ঠাকুরপোই বা কি করিয়া এই অন্যায় আব্দারের প্রশ্রয় দিতেছেন? আগেই ত তিনি বলিয়াছিলেন এ মেয়ে হইতেই যত অমঙ্গলের সূত্রপাত হইবে—ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া গৃহিণী প্রতি রাত্রিতে প্রাণবল্লভের নিদ্রার ব্যাঘাত করিতে লাগিলেন। একদিন একথাও জানাইয়া দিলেন যে, এভাবে বিদেশে থাকিয়া অবশেষে বিষয় ভাগ করিয়া লইবার অভিসন্ধিও যে ইহার ভিতরে নাই তাহাই বা কি করিয়া বলা যাইতে পারে?

বিমলা দেবী যখন নিতান্তই বাড়াবাড়ি করিতে লাগিলেন, তখন প্রাণবল্লভ নিতান্ত বেগতিক দেখিয়া স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া ভাইয়ের কাছে উপস্থিত হইলেন। দুই ভাইয়ে অনেক কথাই হইল। জীবনবল্লভের আর দেশে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয় একথা যখন স্পষ্টই

বলিলেন তখন প্রাণবল্লভ তাঁহাকে এভাবে একাকী না থাকিয়া পুনরায় বিবাহ করিবার আবশ্যকতা বিশেষভাবে জানাইলেন। কিন্তু ইহাতে ভবিষ্যতে কন্যার অসুখের কারণ হইতে পারে ভাবিয়া জীবনবল্লভ সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। প্রাণবল্লভ নিরুপায় হইয়া ক্ষুণ্ণমনে দেশে ফিরিয়া গেলেন এবং তখন হইতে বল্লভপুরের চৌধুরীপরিবারের বন্ধন-সূত্র শিথিল হইবার উপক্রম হইল!

কুড়ি

মনের ভ্রম

সদানন্দ যখন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন কন্যাদায়-গ্রস্তের দল তাঁহাকে পরিণয়-জালে আবদ্ধ করিবার জন্য চারিদিক হইতে 'চার' ফেলিতে লাগিলেন। বিলাত ফেরতার দল, জোড়াসাঁকোর দল, জিলার বাঙ্গালী-সাহেবের দল, কেহই প্রায় বাদ গেলেন না। ওদিকে প্রতুলচন্দ্র পূর্ব্ব হইতেই কোন্ চালে কিস্তিমাৎ করিবেন চতুরতার সহিত সেইভাবে 'বড়ে' টিপিতে লাগিলেন এবং জাতিও যাইবে, পেটও ভরিবে না, ছেলে যাহাতে বোকার মত এমন টোপ গিলিয়া না বসে সে বিষয়ে এবার তিনি সময় থাকিতে বিশেষ সাবধান হইবেন স্থির করিলেন। শুনা যায় এবিষয়ে সুপরামর্শের জন্য ঠাকুরবাড়ীতেও অনেক আনাগোনা হইয়াছিল।

মানুষ ভাবে এক হয় আর! এদিকে জাহাজ হইতে নামিয়াই সদানন্দ সরাসরি রায়-বাড়ীতে গিয়াই উঠিলেন। ফিরিবার পথে তিনি এডেন হইতে পিতাকে যে চিঠি দিয়াছিলেন তাহা প্রতুলচন্দ্রের হাতে পঁহুছিবার বহু পূর্ব্বেই বিলাতের জাহাজ গঙ্গায় আসিয়া নঙ্গর করিল। পুত্র যখন বিলাত হইতে ফিরিলেন পিতা তখন মহকুমার একচ্ছত্র হাকিম। সফরে বাহির হইয়া সদরে ফিরিতে বিলম্ব ঘটায় সদানন্দের চিঠি পাইতে অযথা বিলম্ব হইল। ফলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এত-দিনের সুচিন্তিত পাকা চালটী গোড়াতেই বেচাল হইয়া পড়িল।

অতিবুদ্ধি পিতার পুত্ররত্ন তৎক্ষণে রায়-বাড়ীর জালে আট কাইয়া খাবি খাইতে লাগিলেন!

হাকিম বাহাদুর সফর হইতে মহকুমায় ফিরিয়া স্তূপীকৃত ডাকের চিঠিপত্র ইত্যাদির ভিতর পুত্রের চিঠিখানা পাইয়া সর্ব্বাগ্রে তাহা পাঠ করিলেন। তারিখ ধরিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার চিঠি পাওয়ার দিন কিম্বা পূর্ব্বদিন হয়ত জাহাজ আসিয়া কলিকাতায় পঁহুছিবে। স্বয়ং তাঁহার সে সময়ে উপস্থিত থাকা অসম্ভব দেখিয়া কুক্-কোম্পানীর আফিসের ঠিকানায় সদানন্দের নামে এই মর্ম্মে এক 'তার' করিলেন যে তিনি যেন অন্য কোথাও না উঠিয়া জাহাজ হইতে বরাবর উইলসন হোটেলে গিয়া উঠেন। তাহারপর প্রতুলচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া সকল ব্যবস্থা করিবেন। সদানন্দ কলিকাতায় পঁহুছিবার পরদিন এই টেলিগ্রাম কুক্‌কোম্পানীর হস্তগত হইল এবং যথাসময়ে তাহা সদানন্দ রায়-বাড়ীতে বসিয়াই পাইলেন।

পিতা প্রতুলচন্দ্রের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। মানমর্য্যাদা ও অর্থের প্রলোভন এ সকলই বিফল হইল! পুত্র সদানন্দ একবার যে কথা দিয়াছেন তাহার মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাবিয়া নিজ সঙ্কল্পে অচল-অটল রহিলেন। এবারে সুবিজ্ঞ ডেপুটি মহোদয়কে সুচতুরা রায়-গৃহিণী নিতান্তই ঘোল খাওয়াইয়া ছাড়িলেন! প্রতুলচন্দ্র তখন এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন যে 'ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরিবার' চেষ্টা করিতে যাওয়াটাই তাঁহার নিতান্ত মনের ভ্রম হইয়াছে।

* * * *

যত দিন যাইতে লাগিল জীবনবল্লভ বুঝিতে পারিলেন এভাবে একটী কন্যাকে লইয়া থাকার অনেক অসুবিধা আছে। সদানন্দের বিবাহের সময় হইতে তাঁহার রায়-পরিবারের সহিত রীতিমত আলাপ

হইয়াছে। রায়-গৃহিণীও অনেকদিন তাঁহাকে এ বিষয়ে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশেষে একদিন স্পষ্ট করিয়াই তাঁহাকে পুনরায় বিবাহের উপদেশ দিলেন। সদানন্দও অনেকবার তাঁহার কাছে প্রমীলার প্রশংসা করিয়া মন বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

নীরোদবাসিনীর মৃত্যুর পর একমাত্র পুষ্পময়ীই উষাবালাকে বিশেষভাবে আপন করিয়া লইতে পারিয়াছেন। এখনও প্রতি শনি ও রবিবার উষাবালা প্রাণতোষ বাবুর বাড়ীতেই কাটাইয়া থাকে। জীবনবল্লভ যখন বিবাহের কথা ভাবিলেন তখন পুষ্পময়ীর কথাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার মনে উদয় হইল। অপরদিকে ডাক্তার প্রাণতোষের বাড়ীতেও অনেকদিন হইতেই এ ভাব পরিস্ফুট হইতেছিল। সেদিন জীবনবল্লভ যখন কন্যাকে পুষ্পময়ীর কাছে রাখিয়া যাইতে আসিলেন তখন কথায় কথায় জ্যেষ্ঠা ভামিনী তাঁহার কাছে সে প্রসঙ্গ স্পষ্টভাবে উত্থাপন করিলেন।

ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকিলে বীজ অঙ্কুরিত হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। ইহার উপর যদি আবার সযত্নে সলিল সেচন হইতে থাকে তবে ত কথাই নাই! কাজেই জীবনবল্লভের হৃদয়ক্ষেত্র সত্বরেই পুষ্পান্বিত হইয়া উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

জীবনবল্লভের বহুদিন আর বল্লভপুরে যাওয়া হয় নাই। কলিকাতাতেই তিনি জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেশের সকল সদনুষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইয়াছেন এবং বিজ্ঞানচর্চ্চাতেই অধিকাংশ সময় কাটাইবার অভিলাষ করিয়াছেন। বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে জ্যেষ্ঠ প্রাণবল্লভ কলিকাতায় আসিলে এখন আর কনিষ্ঠের সহিত একসঙ্গে বাস সম্ভব হয় না, এজন্য দেশ হইতে নিজস্ব পাচকঠাকুর ও ভৃত্যাদি সঙ্গে লইয়া আইসেন।

দেশের লোক আক্ষেপ করিয়া বলিত—স্বর্গীয় রতিবল্লভ চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুকালীন উপদেশ পুত্রদিগের মনে কোনই স্থায়ীভাব মুদ্রিত করিতে পারে নাই!

আহার-বিহারে দুই ভাই এখন সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন হইলেও তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তঃসলিলাপ্রবাহ এখনও সমভাবেই বহিতেছে একথা সকলে বুঝিতে পারিত না। কিন্তু বল্লভপুরের চৌধুরাণী ঠাকুরাণীর সেকথা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইল না। স্বামী যেদিন ক্ষুণ্ণ মনে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলেন, সেদিন তাঁহার মনে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল একথা সত্য। তবে সেদিন একথাও ভাবিয়াছিলেন যে, এইবারে বল্লভপুরের বিষয় বিভাগ হইতেও আর অধিক বিলম্ব নাই। কিন্তু যেদিন জানিলেন যে পাছে তাঁহাদের অভাবে নিজ সন্তানেরা উষাবালাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করে এই আশঙ্কায় স্বামী তাহার প্রতিবিধানকল্পে গোপনে এক উইল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন তখন বুঝিলেন তিনি যে মনে মনে ভাবিয়াছিলেন এতদিনে স্বামীর সুবুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে সেটা তাঁহার নিতান্তই **মনের ভ্রম**!

সম্পূর্ণ